এই গ্রন্থে ধৃত অধিকাংশ পদাবলীর রচয়িতাদের সম্বন্ধে
গবেষণামূলক অথচ রসোত্তীর্ণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য

বিমানবিহারী মজুমদার-কৃত

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী

১৪১০-১৯১০

বিমানবিহারী মজুমদার

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ২৯ ॥ কলিকাতা ৯

PANCHSATA BATSARER PADABALI

Biman Behari Mazumder

প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
৩৩ ও ১এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই সংস্করণে 'পদাবলী-সাহিত্যের ভাবাবৈচিত্র্য' নামে একটি নিবন্ধ ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট হইল। ৬৭, ৭৬, ৯৫, ১২৬ ও ২২২ সংখ্যক পদকয়টি এবং একটি পরিশিষ্টও নূতন করিয়া সংযোজন করা হইল।

আশ্বিন ১৩৭৩
গোলাদরিয়াপুর, পাটনা ৪

বিমানবিহারী মজুমদার

ভূমিকা

১ : পদাবলীর দার্শনিক তত্ত্ব

রাধাকৃষ্ণলীলা এবং রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাই পদাবলীর বর্ণিতব্য বিষয়। পদাবলীর মধ্যে জীবাত্মা পরমাত্মার বিরহ-মিলনের তত্ত্ব খুঁজিতে যাওয়া উচিত নহে। শ্রীরাধা জীবাত্মার প্রতীক নহেন। তিনি পরব্রহ্মের হ্লাদিনীশক্তি, আর জীবব্রহ্মের তটস্থাশক্তি। নারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে যে যিনি স্বীয় সংবেদ্য পরমেশ্বর হইতে বিনির্গত, অতএব স্বভাবতঃ সর্বগুণাতীত হইয়াও গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত, সেই তটস্থ চিদ্রূপকেই জীব বলা হয়। শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্মের শক্তিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নাম চিৎশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়াশক্তি এবং এই দুয়ের মধ্যে অবস্থিত তটস্থাশক্তি হইতেছে জীবশক্তি। জীবশক্তি যখন মায়ার কবলে পড়ে তখন সংসারপ্রপঞ্চাদির দুঃখভোগ করে। আর যখন জীবশক্তি অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির অধিকারে আসে তখন ইহা লীলার দর্শনকারিণী ও পুষ্টি-কারিণী হইয়া থাকে। শ্রীজীব গোস্বামী চিৎশক্তিকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই জন্য হ্লাদিনী-সাররূপা শ্রীরাধাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাশক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। কার্য ও কারণ যেরূপ ভিন্ন হইলেও এক, শক্তি ও শক্তিমানও সেইরূপ ভিন্ন হইয়াও একই অদ্বয় তত্ত্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।৪) অতি সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ চৈ. চ. ১।৪

অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অথবা মৃগনাভিকস্তুরী ও তাহার গন্ধ একদিক দিয়া দেখিতে গেলে একই, আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে ভিন্ন। সেইরূপ স্বরূপ হইতে শক্তিকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীয়মান হয় আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ এইজন্য অচিন্ত্য। যে জ্ঞান কোনও যুক্তি-তর্কের দ্বারা

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য জ্ঞান বলে।

কেহ কেহ মনে করেন যে পদাবলীর পাঠক বা কীর্তনের শ্রোতা নিজেকে রাধা বা গোপী মনে করিয়া রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন। এই মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন যে সাধকের পক্ষে নিজেকে নিত্যলীলার পরিকররূপে কল্পনা করা অত্যন্ত অপরাধজনক। সাধক নিজেকে সখীর অনুগতা মঞ্জরীরূপে চিন্তা করিবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এই মঞ্জরী-ভাবের উপাসনার প্রবর্তক। শ্রীরূপ চাটুপুষ্পাঞ্জলিতে শ্রীরাধাকে বীজন করিবার, ও তাঁহার চুল বাঁধিবার ও পান জোগাইবার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। ১৫৪৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত উৎকলিকাবল্লরিতে তিনি রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন জানাইয়াছেন: তোমরা কালিন্দীতীরে বনবিহার করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া যখন মাধবীতলে বিশ্রাম করিবে তখন আমি নিজের কেশপাশ মুক্ত করিয়া উহা দিয়া কবে তোমাদের পাদপদ্ম হইতে ধূলি মুছাইয়া দিব? এই ভাবের অনুসরণ করিয়া রঘুনাথ দাস বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীরাধার দাস্যই চাহেন, অন্য কিছু নহে। সখ্যভাব তিনি চাহেন না, তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করেন।

আমাদের যত কিছু দুঃখের মূল হইতেছে দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে করা। সেই দেহটাকে যদি মায়িক বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মে এবং নিজের স্বরূপতত্ত্বরূপে মঞ্জরীদেহকে আপনার নিত্যদেহ বলিয়া ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে অহংবুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। পদাবলী সাধনভজনের অঙ্গ। সাধক প্রথমে রাধাকৃষ্ণের আনন্দময় মূর্তি ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবেন। তারপর তাঁহাদের লীলাবিলাসাদি মহাজনের পদাবলী ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া তাঁহাদের প্রীতির কথা ধ্যান করিবেন। সমাধিস্থ অবস্থায় সাধকের চিত্তে কেবলমাত্র এই প্রীতির কথাই জাগে, আর কোন ভাবনাই মনে স্থান পায় না। বৈষ্ণব-দর্শনে প্রেম হইতেছে পঞ্চম পুরুষার্থ, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপরে। শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা আস্বাদন সেই পঞ্চমপুরুষার্থ লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম তাহারই আদর্শের দ্বারা আমাদের জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে—ইহাই বৈষ্ণবীয় সাধনার মর্মকথা। বৈষ্ণব মিস্টিকেরা মঞ্জরীর ভাব লইয়া, সখীর অনুগতা হইয়া রাধা-গোবিন্দের সেবা করাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন। নারীভাবে সেবা না করিলে যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা কঠিন হয় তাহা পশ্চিমের মিস্টিক সাধকেরাও অনুভব করিয়াছেন। F. W. Newman লিখিয়াছেন—'If the soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman—yes, however manly you may be among men.'

বৈষ্ণবেরা উপনিষদের রস-ব্রহ্ম বা আনন্দ-ব্রহ্মের উপাসক। আনন্দ হইতেই

এই সমুদয় ভূতের জন্ম হইয়াছে, আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে, তাহারা আনন্দকে জানিতেছে এবং অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে—এই শ্রুতি-বাক্যের সার্থকতা বৈষ্ণবীয় সাধনার মধ্যে নিহিত আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যই প্রধান। ভগবান্ পূর্ণ ঐশ্বর্যময় হইয়াও নরলীলা-রূপ পূর্ণ মাধুর্যের আবরণে নিজেকে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি অচিন্ত্য মাধুর্যের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। বৈষ্ণবের ভগবান্ মানুষের বিশুদ্ধ প্রীতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে— আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনাকে বড় মানে— আমাকে সম, হীন।
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক? তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥ —চৈ. চ. ১।৪

পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে ভগবানের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে নিজের অন্তরঙ্গ-জন ভাবিবার দৃষ্টান্ত প্রতি ছত্রে পাওয়া যায়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে শেষোক্ত চারিটি বা তিনটিই পদাবলী-সাহিত্যের উপজীব্য। কিন্তু শান্ত ও দাস্যভাবের মর্ম না বুঝিলে সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে না। রসের উপাসনার গোড়ার কথা হইতেছে কামনা-বাসনার হাত হইতে মুক্তিলাভ, বৈষ্ণবেরা যাহাকে বলেন— তৃষ্ণাত্যাগ। আমরা তো বাসনার দাস হইয়া জীবন কাটাইতেছি। একের পর এক বাসনা মনে জাগিয়া আমাদিগকে উতলা করিতেছে। আনন্দ-বৃন্দাবনের বাহিরে কংসের রাজ্যে আমাদের বাস। কংসের দুই পত্নীর নাম অস্তি

আর প্রাপ্তি। কংসের মতন আমরাও আমাদের এই ক্ষুদ্র 'আমি'টার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য গোকুলে পরিবর্ধনশীল কৃষ্ণকে হত্যা করাইতে পর্যন্ত প্রস্তুত। একের পর এক বিষয়-ভোগের প্রাপ্তি-সম্ভাবনা আমাদিগের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই অস্তি ও প্রাপ্তির মোহ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে কাম অর্পণ করিয়া আমাদের বৃন্দাবনের আনন্দলোকের সন্ধান করিতে হইবে। শান্তরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটি লক্ষণ আছে। একমাত্র কৃষ্ণেই নিষ্ঠা জন্মে— অপর কিছুর প্রতি আগ্রহ না থাকা বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু কৃষ্ণ পরম করুণাময়। টাকা-কড়ি, সুখ-ঐশ্বর্য প্রভৃতি চাহিলেও তিনি উহা না দিয়া নিজের চরণামৃত প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ —চৈ. চ. ২।২২

শান্তভাবের মধ্যে সেবাভাব নাই। দাস্যভাবে সেবাভাব আছে, কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই। তবে দাস্যভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যবোধ প্রবল। তিনি প্রভু, আমি দাস; তিনি বড়, আমি ছোট—দাসের মনে এই ভাব নিরন্তর জাগে। সখ্যরসে কৃষ্ণের প্রতি এই গৌরববুদ্ধি নাই। সাধক ভগবানকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিজের সমান বিবেচনা করেন—সম্ভ্রমবোধের দ্বারা সখ্যপ্রীতি শিথিল নহে। সখ্যের তিনটি লক্ষণ—বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বাৎসল্যের চারিটি লক্ষণ —মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। আর মধুররসের পাঁচটি লক্ষণ—আত্মসমর্পণ, মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বাৎসল্যরসের সাধক ভগবানকে তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া ভাবনা করেন। শিশু-ভগবান্ আমার প্রতিপালক নহেন, তিনি আমার প্রতিপাল্য—এই ধারণা তাঁহার সমস্ত কর্ম ও চিন্তাকে মধুময় করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে বাৎসল্য এবং গোষ্ঠলীলার পদে সখ্য ও বাৎসল্যের মনোরম উদাহরণ পাওয়া যায়। মধুররসের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়। দেহ, গেহ, পরিজনের কথা ভুলিয়া প্রিয়তমের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করাই হইতেছে মধুরভাবের সাধনার সার কথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার সহিত বলিয়াছেন—

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

কঠোপনিষদে (৬।১৪) আছে যে কামনাসকল মর্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সকল কামনা যখন প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অর্থাৎ

সংসারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কি করিয়া সকল কামনা একেবারে ধ্বংস হইবে? বৈষ্ণবেরা বলিলেন কৃষ্ণকে ভালবাসিলে। সংসারে দেখা যায় যে ভালবাসার জন্য লোকে অনেক কিছু ত্যাগ করে। কিন্তু সে ত্যাগ আত্মতৃপ্তির জন্যই। বৈষ্ণবীয় সাধনায় আত্মাহুতিই প্রথম কথা। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৩।২।২৪) বলিয়াছেন যে একদিন কৃষ্ণের সারথি দারুক কৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। কৃষ্ণসেবার ফলে তাঁহার এমন আনন্দ হইল যে তাঁহার হাত জড়ীভূত হইল, তিনি আর হাওয়া দিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় তিনি এই প্রেমানন্দকে অভিনন্দিত করিলেন না, নিন্দাই করিলেন। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র (২।৩।৩২) কমলনয়না এক কৃষ্ণপ্রেয়সী গোবিন্দ দর্শন করিয়া এমন আনন্দ পাইলেন যে তাঁহার চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া গেল, তাহাতে তাহার দর্শনের বিঘ্ন হইল বলিয়া তিনি নিজের আনন্দকে নিন্দা করিয়াছিলেন। ভক্ত সেবা চাহেন, নিজের আনন্দ নহে। আনন্দ যখন সেবার বিঘ্ন করে তখন সে আনন্দকে পরিহার করিবার জন্য তাঁহার প্রযাস হয়।

পদাবলীর মধ্যে শ্রীরাধার যে ভাববর্ণনা আছে, তাহাতে কামগন্ধ নাই। কামসম্পর্কিত কোন শব্দ কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হইলেও তাহার অর্থ প্রাকৃত কাম নহে। প্রেমই গোপীদিগের ভাব। কাম প্রেমের সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইয়া বলা হইয়াছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য হয় প্রেমে ত প্রবল॥ —চৈ. চ.

শ্রীচৈতন্যের লীলা ও ভাবের অনুসরণ করিয়া পদাবলী আস্বাদন করার রীতি ভক্ত-সমাজে প্রচলিত আছে। সেইজন্য কীর্তনের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গান করা হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম শ্রীচৈতন্যের অশ্রুজলের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত পদাবলী তাঁহার অলৌকিক প্রেমের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছে এই কথা স্মরণ রাখিলে আর চিত্তের মালিন্য জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না।

২ : পদাবলীর রস

পদাবলীতে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের কিছু পদ আছে বটে, কিন্তু শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য। এই শৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। পদাবলীর কৃষ্ণ মাধুর্য-রসময়। তাঁহার ঐশ্বর্য-ভাবকে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে আমাদের ঘরের লোক হইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে আমাদের আপন করিয়া দিয়াছে। আবার বাসু ঘোষ বলেন—

গৌর নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানিত কে ॥ —সংকীর্তন. পৃ ৪

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি প্রেমরসের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

শৃঙ্গার রসের দুই বিভাগ—বিপ্রলম্ভ বা বিরহ এবং সম্ভোগ বা মিলন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে মিলন অপেক্ষা বিরহের স্থান উচ্চে। 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে', বিপ্রলম্ভ না হইলে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, এই কথা গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে (২।৪) লিখিয়াছেন। বিপ্রলম্ভ চার প্রকারের—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানের পর সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্যে সম্পন্ন সম্ভোগ ও প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। বিরহ-মিলনের এই আট অবস্থার প্রত্যেকটি আবার আটটি করিয়া বিভাগ করিয়া চৌষট্টি রসের কীর্তনের কথা বলা হইয়াছে।

৩ : চৌষট্টি রসের কীর্তন

পূর্বরাগ আর অনুরাগ এক নহে। নন্দকিশোর দাস রসকলিকায় লিখিয়াছেন—

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ।
সঙ্গ পরে রাগ যেই সেই অনুরাগ ॥ —রসক. পৃ ১৩৪

পূর্বরাগের উৎপত্তির আটটি প্রকার। তিন রকম দেখা—চিত্রপটে দেখা, স্বপ্নে দেখা ও সাক্ষাৎদর্শনে; আর দূতী, সখী, ভাটমুখে, বংশীগান ও গায়কবর্ণন শ্রবণে, এই পাঁচরকম ভাবে রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া ভালবাসা জাগে। পদাবলীতে ভাটমুখে গায়কের বর্ণনা শুনিয়া পূর্বরাগ জন্মিবার বিবরণ দেখা যায় না।

পূর্বরাগকে বিপ্রলম্ভের মধ্যে স্থান দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন যে নায়ক-নায়িকা পরাধীন (সমাজ ও পরিবারের অধীন) বলিয়া তাঁহারা অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন না, তাই পূর্বরাগেও উভয়ের বিয়োগবৎ বিরহাবস্থা দেখা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্বরাগের দশটি দশার কথা লিখিয়াছেন—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ (নিদ্রাহীনতা), তানব (কৃশ হইয়া যাওয়া), জড়িমা, বৈয়গ্র্য (ব্যগ্রতা), ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মরণ-উদ্যম)। শ্রীরূপ ইহার প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়াছেন। আমরা কেবলমাত্র মোহের উদাহরণটি ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে অনূদিত শচীনন্দনের উজ্জ্বলচন্দ্রিকা হইতে দিতেছি—

নাসায় নিশ্বাস নাই বিঘটিত আঁখি দুই
বধুর ব্যাধি ঠাহরিতে নারি।

কৃষ্ণতিল আনি দেহ সংস্কার করিব দেহ
এই বাক্য বলিল শাশুড়ী ॥
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণে প্রবেশ করিল কর্ণে
তেই অঙ্গে হইল কম্পন।
মোর বুদ্ধি বড় ধীর ভাবিয়া করিলাম থির
তুমি বট তাহার কারণ ॥ —উ. চ. পৃ ১৬৮

বিশাখা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে রাধার মৃতপ্রায় অবস্থা দেখিয়া জটিলা বলিলেন যে এ বেচারা তো বাঁচিবেই না, মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণতিল দিয়া ইহার দেহ-সংস্কার করা (প্রায়শ্চিত্ত) প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ' শব্দ কানে যাইতেই কিন্তু রাধার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মোহন! তুমিই আমাদের সখীর এই অবস্থার জন্য দায়ী। এই ভাবটি লইয়া রচিত কোন পদ এ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই।

পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে নির্জনে মিলিত তরুণ-তরুণীর দর্শন-স্পর্শনাদির দ্বারা উভয়ের উল্লাসোপরি যে ভাব হয়, তাহাকে সম্ভোগ বলে। এখানে ভাবের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। যেখানে লজ্জা, ভয় ও অধৈর্য বশতঃ নায়ক-নায়িকা সম্ভোগাঙ্গ বস্তুসমুদয় অল্পমাত্রায় ব্যবহার করে তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগেরও আট বিভাগ—

সেই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ অষ্টমত।
বাল্যে মিলন, গোষ্ঠে মিলনাদি যত ॥
গোদোহনে, চুম্বনে, বা অঙ্গের স্পর্শনে।
বস্ত্রাপকর্ষণে, পথরোধে বা সঙ্গমে ॥ —সংকীর্তন. পৃ ১০

মান-বিপ্রলম্ভের কারণ থাকিতে পারে বা বিনা কারণে মান উপস্থিত হইতে পারে। সহেতুমান ছয় প্রকারের। সখীমুখে, শুকমুখে বা মুরলীর গানে অন্যের প্রশংসার কথা শুনিয়া মান হইতে পারে। অথবা নায়কের গোত্রস্খলনে অর্থাৎ রাধা বলিতে যাইয়া চন্দ্রাবলী বলিয়া ফেলায়, কিংবা স্বপ্নে অন্যের সঙ্গে নায়কের বিলাস দেখিয়া হইতে পারে—এ দুইটি ক্ষেত্রে নায়িকার অনুমিতিই মানের কারণ। আর নায়কের দেহে ভোগচিহ্ন দেখিয়াও মান জন্মিতে পারে। নির্হেতু মান কারণাভাসে ও অকারণে হয়। রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে লিখিয়াছেন—

মানের নায়িকাগণ হয় নানা গতি।
কোমল কর্কশা মৃদু হয় এই রীতি ॥
রসের কলহ কিবা গোত্রের স্খলন।
অন্যের প্রশংসা কিবা অন্যের ভূষণ ॥
গর্ব অসূয়া গ্লানি আর চিন্তাময়।
নির্হেতু মান প্রেমের স্বভাবাতিশয় ॥ —রসকল্প.

মানের পর সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। নির্হেতুক মান আলিঙ্গন, স্মিতহাস্য প্রভৃতির দ্বারা এবং সহেতুক মান সাম, ভেদ, দান, নতি ও উপেক্ষার দ্বারা প্রশমিত হয়।

তপ্ত ইক্ষু চর্বণ সমান সুখাস্বাদ।
সঙ্কীর্ণ সম্ভোগরস মানের পশ্চাৎ॥ —সংকীর্তন, পৃ ১১

মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচুরি, নৌকাখণ্ড, মধুপান ও সূর্যপূজা—এই আটটি লীলায় সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ ঘটে।

বৈষ্ণবপদাবলীর সর্বাপেক্ষা বিচিত্র লীলা হইতেছে প্রেমবৈচিত্ত্য। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রিয়তমের সন্নিধানেও প্রেমোৎকর্ষবশতঃ বিরহব্যাকুলতা। রসকল্পবল্লীতে কবিত্ব করিয়া বলা হইয়াছে—

অঞ্চলে বান্ধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ঘরে।
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে॥ —রসকল্প,

দীনবন্ধু দাসের মতে প্রেমবৈচিত্ত্যের আট বিভাগ হইতেছে রূপানুরাগ, উল্লাস-অনুরাগ, পাঁচ প্রকারের আক্ষেপানুরাগ (কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীকে, আপনাকে, সখীগণে, দূতীর প্রতি) এবং রসোদ্গার। অনুরাগের সংজ্ঞাটি বড় সুন্দর—

অনুভূত হঞা পুন দর্শন স্পর্শন।
নূতন করিঞা মানে প্রেমে অচেতন॥
তাহাতে জন্মায় রাগ নূতন নূতন।
অনুরাগ নাম তার কহে সর্বজন॥ —সংকীর্তন,

আক্ষেপানুরাগের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন রামগোপাল দাস—

আক্ষেপানুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগ্ দরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে॥
কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে॥
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীল জাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্যভাব গতি॥
কন্দর্পেরে মন্দ বলে করিয়া ভর্ৎসনা।
বিপক্ষাদির ব্যঞ্জিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা॥
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈবে রোষে।

ইহাতে দেখা যায় যে আক্ষেপানুরাগ আট প্রকারের—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, দূতীর প্রতি, সখীর প্রতি, গুরুজনের প্রতি, নিজের কুলশীলজাতির প্রতি, কন্দর্পের প্রতি, বিধাতার প্রতি। হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিয়াছেন যে, রসকীর্তনে নায়িকার আক্ষেপানুরাগকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হয়। এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নহে।

প্রেমবৈচিত্ত্যের পর সম্পন্ন সম্ভোগ। কিছুদূরে যাইবার পর কান্তের সহিত

মিলনে সম্পন্ন সম্ভোগ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহাকে আগতি ও প্রাদুর্ভাব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বন প্রভৃতি কোন নিকট স্থান হইতে প্রিয় যখন ঘরে ফেরেন তখন হয় আগতি। আর বিরহ-বিহ্বলার নিকট সহসা প্রিয়তমের আগমন হইতেছে প্রাদুর্ভাব। পরবর্তী রসশাস্ত্রে সম্পন্ন সম্ভোগের আটটি লীলা দেওয়া হইয়াছে—দূরে দর্শন, দোল বা হিন্দোল (ঝুলন), হোলী, প্রহেলিকা বলা ও তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করা, পাশাখেলা, নৃত্যরাসকেলি, রসালস ও ধূর্তনিদ্রা। বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাস কয়েকটি প্রহেলিকাপদ রচনা করিয়াছেন। পাশাখেলার পালা এককালে খুব প্রচলিত ছিল বলিয়া বাসু ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের পাশাখেলা লইয়া একটি পদ লিখিয়াছেন। ধূর্তনিদ্রা অর্থে কপটনিদ্রা।

প্রবাস, বিপ্রলম্ভ, নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস ভেদে দ্বিবিধ (উজ্জ্বলনীলমণি ১৫।১৫২)। কালিয়দমনে, গোচারণে, নন্দমোক্ষণে, কার্যানুরোধে স্থানান্তরে গমনে এবং রাসে অন্তর্ধানে—এই পাঁচ প্রকারে নিকট প্রবাস হয়। নন্দকে একবার আসুরী বেলায় স্নান করিবার অপরাধে বরুণালয়ে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বরুণভবনে যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন। ইহাই হইতেছে নন্দমোক্ষণ (ভা. ১০।২৮)। এই লীলা লইয়া কোন পদ রচিত হয় নাই। দূর প্রবাস তিন প্রকারের। ভাবী, ভবন্ ও ভূত বা মথুরা প্রবাস। ভাবী বিরহের অর্থ, হঠাৎ মনে হয় বিরহ ঘনাইয়া আসিতেছে। যেমন একখানি রথ আসিয়াছে দেখিয়া আশঙ্কা হয় বুঝি কৃষ্ণ ঐ রথে চড়িয়া চলিয়া যাইবেন। ইহাতে নানারূপ অমঙ্গল-দর্শন ঘটে। ভাবী বিরহের উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

নন্দ ঘোষের আজ্ঞাকারী এক দূত সবাকারি
ঘরে ঘরে করিছে ঘোষণা।
আসিয়াছে অক্রূর হরি যাবে মধুপুর
কালি প্রাতে করিবে গমন॥
বড় অমঙ্গল দেখি নাচিছে দক্ষিণ আঁখি
কাঁপিছে দক্ষিণ পয়োধর।
চঞ্চল হইল মন স্থির নহে একক্ষণ
না জানিয়ে কি হইবে মোর॥ —উ. চ. পৃ ১৮৩

ভবন্ বিরহের দৃষ্টান্ত—

দিবাকর মণ্ডলে প্রকাশ গগন তলে
অক্রূর সাজায়া রথখানি।
এস বলি কৃষ্ণে ডাকে শেল মারে মোর বুকে
এখনি চলিল ব্রজমণি॥
হেদে রে কঠিন মান আর দেহে থাক কেন
আমার হৃদয় ফাটি যায়।

বিনয় করি যে আমি ত্বরা করি যাও তুমি
ঐ দেখ ঘোটক চালায়॥ —উ. চ.

শ্রীকৃষ্ণ যখন আসিবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন সেইদিন উত্তীর্ণ হইবার পর ভূত প্রবাস। এই অবস্থায় নায়িকার যে দশ দশা হয় শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার নাম দিয়াছেন—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তাণব বা কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

দূর প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। সুদূর প্রবাসে নায়ক রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সহিত নায়িকার দেখাসাক্ষাৎ ঘটা দুর্লভ হয়। ইহার পর মিলনে যে উপভোগাতিরেক হয় তাহাই সমৃদ্ধিমান্। দীনবন্ধু দাস সংকীর্তনামৃতে স্বপ্নসম্ভোগ, কুরুক্ষেত্রে মিলন, বাক্যে বিলাস, ব্রজে আগমন, কৌতুক ভোজন, একত্র নিদ্রা প্রভৃতি ও স্বাধীনভর্তৃকা—এই আটটি বিভাগ দেখাইয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে—

মথুরা হইতে ব্রজে নাহি আগমন।
স্বপ্ন সন্দর্শনে মাত্র জানিহ সঙ্গম॥
নিত্য কৃষ্ণ যদি আছে বৃন্দাবনে।
ব্রজবাসী কৃষ্ণ দেখি স্বপ্ন সম মানে॥
সাক্ষাৎ মিলন নাই শাস্ত্রে পরকাশ।
অতএব সেখানে সঙ্গত ভাবোল্লাস॥
নায়ক আসিবে বলি মনের উল্লাস।
সঙ্গম সমান ভাব নাম ভাবোল্লাস॥ —পৃ ১৪৭

৪ : চৌষট্টি নায়িকা

শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা—নায়িকার এই আট বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পূর্বে শ্রীধর দাস সদুক্তিকর্ণামৃতে বিভিন্ন অবস্থার নায়িকার মনোভাবের বর্ণনামূলক বহু শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পদাবলীর ভাবমাধুর্যের তুলনায় সেসব শ্লোক ফিকা মনে হয়।

উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে (১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে) ও তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরীতে অষ্টনায়িকার আবার প্রত্যেকের আট আটটি করিয়া বিভাগ দেখাইয়াছেন। রামগোপাল বা গোপালদাস একজন বড় কবি ছিলেন, পীতাম্বরও পদ লিখিতে পারিতেন। তাঁহাদের রস-বিশ্লেষণ-চাতুর্য অসাধারণ।

১. অভিসারিকা

অভিসারিকার আট বিভাগ সম্বন্ধে পীতাম্বর লিখিয়াছেন—

সেই অভিসার হয় অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা-অভিসার॥
কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।
গীতপদ্য শাস্ত্রে সর্বজনোৎকরা॥

জ্যোৎস্নারাত্রে, অন্ধকার রাত্রে, বর্ষার রাত্রে, বাদলা দিনে, কুয়াশাপূর্ণ প্রভাতে, মাঘমাসে শেষ রাত্রিতে পবিত্র নদীতে স্নান করিবার ছলে নায়িকা অভিসারে বাহির হইতে পারে। যখন অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার মতন অবস্থা নায়িকার থাকে না, মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া পাগলিনীর মতন বাহির হইয়া যায় তখন তাহাকে উন্মত্ত অভিসারিকা বলে।

মুরলীক নাদ যব শুনই শ্রবণে।
উন্মত্তা হইয়া চলে নায়ক মিলনে॥
বি-ভূষণ হইয়া নিঃশঙ্ক চলি যায়।
বাটপাড় লম্পট ভয় নাহি তায়। —রসম.

সঞ্চরাভিসারিকাও পাগলিনীর মতন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। বেশভূষা করিবার মতন ধৈর্য বা চিত্তের স্থৈর্য তাহার নাই। মুরলীর রব শুনিয়া সে হাতের কঙ্কণ পায়ে পরে, পায়ের নূপুর ভুজে পরে, কপালে অঞ্জন লাগায়, আর অধরে সিন্দুর দেয়।

অনঙ্গবাণে মহা পীড়া অশঙ্কিত মন।
নিজগৃহে স্থির নহে মন উচাটন॥
নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে।
ভুজে নূপুর দেই কঙ্কণ পদে ধরে॥
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।
উন্মত্তা হয় সেই মুরলীর স্বরে॥ —রসম.

২. বাসকসজ্জা

নিজের অবসর অনুসারে প্রিয়তম আসিবেন এই ভাবিয়া যিনি নিজের দেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন তাঁহাকে বাসকসজ্জিকা বলে। ইহার আবার আট রকম —মোহিনী, প্রতীক্ষায় জাগ্রতা, নায়কের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া রোদনপরায়ণা, মধ্যোক্তিকা বা কান্ত আসিয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন এই চিন্তা করেন ও এই কথা বলেন যিনি, সুপ্তিকা, চকিতা, সুরলা বা সঙ্গীতপরা এবং উদ্দেশা বা দূতী প্রেরণ করেন যিনি। রসমঞ্জরীতে চকিতার পরিবর্তে প্রগল্‌ভা ধরা হইয়াছে। পীতাম্বর দাসের বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ।

মোহিনী : সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে।
কৃষ্ণকে করিবে মোহ অনুমানে চিতে ॥

জাগ্রতী : নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ।
উঠি বসি দ্বারে যাই করে নিরীক্ষণ ॥

রোদিতা : বিলাপ করিয়া ধনি করয়ে রোদন।
অন্তরে হরষ হয় নায়ক মিলন ॥

মধ্যোক্তিকা : নিকুঞ্জ কানন ধনি করে পরিষ্কার।
নিজ গুণ গরিমা কিছু করয়ে বিচার ॥
নায়ক আইলে যেমতে করিব মিলন।
মন কত আশা করে কেলি সোঙরণ ॥

সুপ্তিকা : কুসুম শয়ানে মুকুতাপাত শয়নে উল্লাস।
সখী সঙ্গে করে সদা হাস পরিহাস ॥

প্রগল্‌ভা : প্রগল্‌ভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া।
নায়ক আসিবে বলি উলসিত হিয়া ॥
কিশলয় শেজ করে, বকুল বিছায়।
দূতীকে তর্জন করি সঘনে পাঠায় ॥

সুরসা : নিজ মন্দিরেতে রহে নির্ভর হইয়া।
বস্ত্রাভরণ পরে শেজ বিছাইয়া ॥
বিলম্ব দেখিয়া কিছু করে অনুবাদ।
দূতী পাঠাইয়া আনে নায়ক সংবাদ ॥

উদ্দেশা : নানাবিধ করি রহে সঙ্কেতে যাইয়া।
নায়ক আসিবে মনে উলসিত হিয়া ॥
নায়ক উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায়।
নানা উপচার করি মঙ্গল গায় ॥

৩. উৎকণ্ঠিতা

বাসকসজ্জার শেষে, কলহান্তরিতা অবস্থায় এবং নায়ক-নায়িকার পরাধীন অবস্থার জন্য মিলনের অভাবে উৎকণ্ঠা জন্মে। দয়িতের বিলম্ব দেখিয়া বিরহে পীড়িত ভাবকে উৎকণ্ঠিতা বলে। উজ্জ্বলনীলমণির (৫।৭৯-৮১) মতে নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সঙ্কেতস্থলে না আসিলে যে নায়িকা উৎসুকা হন তাঁহাকে উৎকণ্ঠিতা কহে। ইহারও আট বিভাগ। দুর্মতি (কেন খলের কথায় বিশ্বাস করিলাম এই চিন্তায় ব্যথিত), বিকলা, স্তব্ধা (চিন্তিতা), উচ্চকিতা (পাতাটি পড়িলেও কান্ত

আসিতেছেন ভাবিয়া চকিতা), অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, মুখরা এবং নির্বন্ধা। রসমঞ্জরীতে দুর্মতি স্থলে উন্মত্তা আছে। ঐ গ্রন্থে—

বিকলার লক্ষণ : নায়ক না দেখি ধনি হয়ত বিকলা।
পথপানে চাহে ধনি হইয়া চঞ্চলা ॥
কামশরে জর জর করয়ে রোদন।
কতক্ষণে হইবেক নায়ক মিলন ॥

শুন্ধা : ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কাতর রমণী।
নায়ক বিলম্বে নখে লিখয়ে ধরণী ॥
শয্যায় শয়নে ক্ষণে কামাতুর হঞা।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ধায় তমাল দেখিঞা ॥

সুখোৎকণ্ঠিতা : পূরবে মুগধা যেন করয়ে বিলাস।
সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস ॥
সত্বরে আনহ সখী কেলি-মথন।
পূরব বিলাস মোর হয়ত স্মরণ ॥

মুখরা : শয্যা তেজিয়া রামা ক্ষণে বাহিরায়।
ক্ষণে মূরছিত তনু কান্দে উভরায় ॥
ক্ষণে বাহিরায় ক্ষণে চলে আধপথ।
দূতীসহ কলহ করয়ে অনুরত ॥

নির্বন্ধা : আমার কর্মদোষে দয়িত আসিলেন না, হায় আমি আর বাঁচিব না, এইরূপ খেদকারিণী।

৪. বিপ্রলব্ধা

সঙ্কেত করিয়াও যদি প্রিয়তম না আসেন, তাহাতে যিনি ব্যথিতা হইয়া খেদ করেন তাঁহাকে বিপ্রলব্ধা বলে (উ. নীল. ৫।৩-৮৪) উজ্জ্বলচন্দ্রিকায় আছে—

সঙ্কেত করিয়া যার পতি নাহি মিলে।
দুঃখিত হৃদয়া, তারে বিপ্রলব্ধা বলে ॥
মূর্ছা, নিশ্বাস বহে করে বহু খেদ।
দুনয়নে অশ্রু বহে, অধিক নির্বেদ ॥

বিপ্রলব্ধার আট ভেদ—বিফলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, উন্মাদরা, ভীতা। প্রিয়তম আসিল না বলিয়া সমস্ত বিফল হইল ভাবিয়া যিনি খেদ করেন তাঁহাকে বিফলা বলে। পীতাম্বর দাস ইহাকে নির্বন্ধা বলিয়াছেন। অন্যান্য প্রকারের বিপ্রলব্ধার বর্ণনায় তিনি কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

প্রেমমত্তা : নানা আভরণ পরি রহয়ে সঙ্কেতে।
জাগিয়া পোহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে॥
আপন যৌবন দেখিয়া কান্দিয়া বিকল।
নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল॥

ক্লেশা : নায়ক না আইল ঘরে জানিয়া নিশ্চয়।
সহচরী সঙ্গী সব দুঃখ কথা কয়॥

বিনীতা : বিরহে বিনয় বাক্য কহয়ে সখীরে।
ঝাঁপ দিব আজি আমি যমুনার নীরে॥

নির্দয়া : সখী মুখে শুনি নায়ক আজি না আইল।
মিথ্যা সঙ্কেত মানি রজনী পোহাইল॥
হার মালা আভরণ ছিঁড়িয়া ফেলায়।
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায়॥

প্রখরা : জাগিয়া নয়নের জল নিরবধি ঝরে।
বিরহ বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে॥

দূত্যাদরা : নায়ক আসিবে ঘরে সঙ্কেত জানিল।
কোকিলের বাণী হেন শব্দ শুনিল॥
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর।
নায়ক বিমুখ হয়্যা গেল নিজঘর॥

৫. খণ্ডিতা

সঙ্কেতকালে না আসিয়া, যে নায়িকার দয়িত অন্য নায়িকার সহিত বিলাস করার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে আসেন তাঁহাকে খণ্ডিতা বলে।

সময়ে না মিলে পতি রহে অন্য সনে।
রতিচিহ্ন সহ প্রাতে দেয় দরশনে॥
তা দেখি নায়িকার হয় রোষ নিশ্বাস।
কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহুভাষ॥

খণ্ডিতার আট প্রকার ভেদ—নিন্দা বা কান্তের নিন্দাকারিণী, ক্রোধ বা অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কারকারিণী, ভয়ানকা বা সিন্দুর-কজ্জল প্রভৃতি ভোগচিহ্ন ধারণকারী নায়ককে দেখিয়া যিনি ভীতা হয়েন, প্রগল্‌ভা অর্থাৎ কান্তের সহিত কলহকারিণী, মধ্যা বা অন্য নায়িকার সম্ভোগ চিহ্ন দেখিয়া লজ্জিতা, মুগ্ধা বা যিনি মৌন ও কাতর ভাবে থাকেন অথচ চোখে যেন জল আসে, কম্পিতা বা ক্রোধবশে রোদনপরা, এবং সন্তপ্তা।

৬. কলহান্তরিতা

খণ্ডিতার পর কলহান্তরিতা। খণ্ডিতা অবস্থায় প্রিয়তমকে উপেক্ষা করিয়া অনুতাপ করেন যে নায়িকা তাঁহাকে কলহান্তরিতা বলে। উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে শচীনন্দন লিখিয়াছেন—

খণ্ডিতা হইয়া করে পতির তাড়ন।
পশ্চাতে হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ॥
প্রলাপ, নিঃশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপিত মন।
কলহান্তরিতা তারে কহে কবিগণ॥

পীতাম্বর দাস ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

চরণে ধরিয়া কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিঠুর কথা অপমান করে॥
বিমুখ হইয়া কান্ত নিজ ঘরে যায়।
পিছে অনুতাপ করে বিকল হয়্যা তায়॥

কলহান্তরিতার আট প্রকার ভেদ : ১. আগ্রহা—আগ্রহযুক্ত নায়ককে কেন উপেক্ষা করিলাম ; ২. ক্ষুব্ধা বা বিকলা—পায়ে পড়িয়াছিল যে দয়িত তাহাকে কেন দুর্বাক্য বলিলাম ; ৩. ধীরা—পাদপতিত প্রিয়তমকে কেন দেখি নাই ; ৪. অধীরা—সখীরা যাঁহাকে তিরস্কার করেন এই বলিয়া যে তাঁহাদের কথা তিনি শোনেন নাই কেন ; ৫. কুপিতা—অনুতাপের মধ্যেও কান্তের মিথ্যা বলার কথা মনে করিয়া যিনি রাগ করেন ; ৬. সমা—যিনি ভাবেন যে কান্তেরই শুধু দোষ নাই, দূতীর, আমার নিজের এবং ভাগ্যের দোষে আমি দুঃখ পাইলাম ; ৭. মৃদুলা বা মন্থরা—পরিতাপে যিনি ক্রন্দন করেন ; ৮. বিধুরা—সখীগণ যাঁহাকে আশ্বাস দেন যে আবার মিলন ঘটাইয়া দিবেন।

৭. প্রোষিতভর্তৃকা

নায়ক দূরদেশে গেলে নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। উজ্জ্বলচন্দ্রিকায় ইহার বর্ণনা যেমন ব্যাপক, তেমনি রসঘন—

দূরদেশে পতি গেলে নারীর দুঃখ হয়।
প্রোষিতভর্তৃকা পদে তাহাকে কহয়॥
প্রিয়সঙ্কীর্তন, জাড্য, অঙ্গের মালিন্য।
ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ দৈন্য॥
প্রলাপাদি চেষ্টা প্রোষিতভর্তৃকার।
প্রিয়ের আগতি চিন্তা করে বার বার॥ —উ. চ. পৃ ৪৫

ইহার আটটি বিভাগ—১. ভাবী, ২. ভবন্, ৩. ভূত, ৪. দশ দশা, ৫. দূত-সংবাদ, ৬. বিলাপা, ৭. সখ্যুক্তিকা—যাঁহার সখী কান্তের নিকট গিয়া বিরহবেদনা

জানান, ৮. ভাবোল্লাসা বা ভাবসম্মিলনে উল্লসিতা। প্রবাস বিপ্রলম্ভে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৮. স্বাধীনভর্তৃকা

নায়ক যে নায়িকার বশে বা অধীনরূপে সর্বদা নিকটে থাকেন তাঁহাকে স্বাধীন-ভর্তৃকা বলে। পীতাম্বর দাস বলেন—

স্বাধীনভর্তৃকা কথা শুন দিয়া মন।
কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা বিচক্ষণ॥
উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা, অভিষেকা।
স্বাধীনভর্তৃকা এই অষ্ট করি লেখা॥

বিলাসের সময় মনে খুশি কিন্তু বাহিরে রোষযুক্তাকে কোপনা বলে। নায়কের অঙ্গে নিজকৃত বিলাসচিহ্ন দর্শন করিয়া মানকারিণীকে মানিনী কহে। নায়ক যাঁহার বেশবিন্যাস করিয়া দেন তাঁহাকে মুগ্ধা বলে। নায়ক যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ তিনি মধ্যা। সমীচীন উক্তি যিনি করেন তিনি উক্তকা বা সমুক্তিকা। কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা উল্লাসা বা সোল্লাসা। নায়ক যাঁহার অনুকূল তাঁহাকে অনুকূলা এবং অভিষেক করিয়া নায়ক যাঁহাকে চামরব্যজনাদি করেন তাঁহাকে অভিষেকা বা অভিষিক্তা বলে। জলকেলি, বনবিহার, কুসুমচয়ন, এবং নায়িকার আদেশে যখন নায়ক কেশবিন্যাস করিয়া দেয় তখন নায়িকার স্বাধীনভর্তৃকারূপ দেখা যায়।

অষ্ট নায়িকার আট আটটি বিভাগ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডীদাস অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া পদ লেখেন নাই। বিদ্যাপতি অবশ্য প্রাক্-চৈতন্য যুগের অলঙ্কারশাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহা হইতে অমৃত তুলিয়া নিজের পদাবলীতে সন্নিবিষ্ট করেন। কিন্তু শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট এত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস কবিরাজ, সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাধামোহন ঠাকুর ও নরহরি চক্রবর্তী উজ্জ্বলনীলমণিকে অনুসরণ করিয়া পদরচনা করেন। কিন্তু এমন অনেক ভাব ও লীলা আছে যাহার ইঙ্গিত শ্রীরূপ গোস্বামী করিয়াছেন অথচ পদাবলীতে তাহা বর্ণিত হয় নাই।

৫ : পদাবলী-সাহিত্যের ভাষাবৈচিত্র্য

দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দে (১।৩) 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে পদাবলী সব সময়ে কোমল ও কান্ত ভাষায় রচিত হয় নাই।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি দুই বিভিন্ন ধারায় পদ রচনা করেন। একজনের পদ খাঁটি বাংলা

অলঙ্কারবাহুল্য-বর্জিত, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিবার জন্য লেখা। অন্যের পদ রাজরানীর মত অলঙ্কারভূষিতা, উহা মস্তিষ্কের আলোড়ন ঘটাইয়া হৃদয়ে পৌঁছায়। উভয়ে কিন্তু প্রাকৃতভাষার পূর্ববর্তী কবিদের নিকট ঋণী। ঐ কবিদের নাম জানা যায় না ; কাল নির্ণয় করাও কঠিন। তবু তাঁহারা এত খ্যাতিমান ছিলেন যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিকর্ণপুরের 'অলঙ্কারকৌস্তুভে' তাঁহাদের পদ ধৃত হইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে যে কি বিষয়নির্বাচনে, কি শব্দচয়নে এই সব কবির রচনা পদাবলী-সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বর্ষাকাল আসিয়াছে। গাছে কদমফুল ফুটিয়াছে। ভ্রমর মধুলোভে ঘুরিতেছে। জলের ভারে শ্যামল মেঘ দেখা দিয়াছে। বিদ্যুৎ যেন তাহার বুকে নাচিতেছে। এত উদ্দীপনের প্রভাবে বিরহিণী নায়িকা বলিতেছে, প্রিয়সখি ! বল তো, আমার দয়িত কখন আসিবে। জাপানী কবিতার মতন ছোট্ট একটি পদে এত কথা কেমন সুন্দর ভাবে গুছাইয়া বলা হইয়াছে—

ফুল্লা নীবা ভম ভমরা
দিট্ঠা মেহা জলসমলা।
নচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ
আবে কন্তা কহু কহিআ ॥ —প্রাকৃতপৈ.

নীল এখানে নীবা, শ্যামলা—সমলা, কদা বা কখন—কহিআ, এবং কান্ত ছন্দের অনুরোধে 'কন্তা' রূপ ধারণ করিয়াছে। পরিবেশ পদাবলীর অনুকূল। পদাবলীতে মেঘকে মেহ বা মেহা ও ভ্রমণ করাকে ভম বহু স্থানে বলা হইয়াছে।

মানের এই পদটিকে অনায়াসে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায় :

মানিনি মাণহিঁ কাইঁ ফল
এআ জ চরণ পড়ু কন্ত।
সহজ ভুঅঙ্গম জই নমই
কি করিয়ে মণিমন্ত ॥ —প্রাকৃতপৈ.

হে মানিনি ! যদি এমনিতেই কান্ত পায়ে পড়ে তো মান করিয়া কি লাভ ? যদি ভুজঙ্গ (সর্প, ব্যঙ্গার্থ লম্পট) সহজেই নত হয়, তো মণিমন্ত্র প্রয়োগ কি জন্য ?

কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কারকৌস্তুভ লিখিলেও উদাহরণ দিতে যাইয়া অনেকগুলি প্রাকৃত পদ তুলিয়াছেন। ঐগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার লেখা নহে। তিনি ছোটবেলা হইতে মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। প্রাকৃত ভাষায় পদ লিখিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না ! তাঁহার ধরা একটি মানের পদ—

হিঅঅং চেবঅ অনচ্ছং মাণং সিনি ম উণ দে অঙ্গং।
আলিঙ্গন্তি পআনং নহরা পড়ি বিম্বিঅং কহ্নং॥ —কৌস্তুভ., ২য় কিরণ

তোমার হৃদয়ই অনচ্ছ (রোষের আবেশে কলুষিত), কিন্তু অঙ্গ সেরূপ অনচ্ছ নহে। দেখ, তোমার চরণনখর প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে।

অল্পকথায় এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে মানবশে নায়িকা নখছাড়া সকল অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং চোখও বন্ধ করিয়া আছেন।

মুরলীর প্রতি আক্ষেপের একটি প্রাকৃত পদও কবিকর্ণপুর ধরিয়াছেন—

অই পিঅসি গোবিআণং পেঅং
কহ্নস্স অহর পল্লঅং মুরলি।
নিঅপর বিবেঅ কুসলা
অম্মো নো হোন্তি সচ্ছিদাঃ॥ —কৌস্তুভ. ৩য় কিরণ

পিঅসি মানে পিবসি (পান কর), গোবিআণং মানে গোপিকানাং, অহর শব্দে অধর, বিবেঅ অর্থে বিবেক। হে মুরলি! শ্রীকৃষ্ণের যে অধরপল্লব গোপিকাদের পেয়, তুমি তাহাই পান করিতেছ। কি আশ্চর্য, যাহারা সচ্ছিদ্র তাহারা কোন্‌টা নিজের জিনিস কোন্‌টা পরের তাহা বিবেচনা করে না।

প্রাকৃতপৈঙ্গলে ধৃত নৌকাবিলাসের পদটি অনেকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে উহার প্রভাব সম্বন্ধে কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। পদটি এই—

অরেরে বাহহি কাহ্ন নাব,
ছোডি ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তই ইথি ণদিহিঁ সঁতার দেই
জো চাহহি সো লেহি॥ —প্রাকৃতপৈ., পদসং. ৯

হে কৃষ্ণ! নৌকা চালাও, এই নৌকা ছোট, ইহাতে ডগমগ গতি দিও না (দোলাইও না)। এই নদীতে সাঁতার দিয়া (পার করিয়া) তুমি যাহা চাহ লইও।

ঠিক এইভাবে সোজাসুজি দেহদান করিতে রাজি হওয়ার কথা বৈষ্ণব পদকর্তারা বলেন নাই। বংশীবদন সখীদের সহিত কথাবার্তায় নায়িকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

মুচকি হাসিয়া নেইয়া যায় পান চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেইজন ধায়॥

জ্ঞানদাসের রাধা বলেন—

নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।

ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে ॥

মুসলমান কবি সৈয়দ মর্তুজা প্রাকৃতপৈঙ্গলের উপর আর এক ধাপ আগাইয়া রাধাকে দিয়া বলাইয়াছেন—

পার কর পার কর নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কর রে ॥
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার।
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার ॥
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকাকিনি।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধে গোয়ালিনী।
কানাইয়ের বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী ॥
—ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি,' ১ম খণ্ড

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সৈয়দ মর্তুজার পদে একটিও তথাকথিত ব্রজবুলি নাই। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নামক গ্রন্থে যে ১০২টি পদ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এক সালবেগ ছাড়া অন্য কোন কবি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা সকলেই পদকর্তা চণ্ডীদাসের মতন খাঁটি বাংলায় পদ লিখিয়াছেন। সালবেগ যে উৎকলের লোক তাহা পদকল্পতরুতে ধৃত তাঁহার পদ দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি নীলাচলচন্দ্রের স্তবে লিখিয়াছেন—

সে বাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি
ঢারউ তাকন্থু মাথন্থি। —তরু. পদসং. ১৫৪২

রাধার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন—

জোমি জল বহন্তি বেণি ঝাঁপি ঝলকিতা। —তরু. ২৪৭২

কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব হইয়া শেষজীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার লেখা আরতির পদে ব্রজবুলির কিছু ছাপ দেখা যায়—

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে,
শীশ মোর—মুকুট নট, শোহে কটি পীত-পট
কিঙ্কিণি অধিক শোহাও না রে। —তরু. ১৯১২

ব্রজমণ্ডলের লোকে যাহাতে বাংলা পদ সহজে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্রজবুলি ব্যবহার করা হইত বলিয়া মনে হয়। আসামের শঙ্করদেব উড়িষ্যার রায় রামানন্দ, গুজরাটের নরসি মেহতার রচনাতেও ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যায়। রায় রামানন্দের সুপ্রসিদ্ধ পদ—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি॥ —চৈ. চ.

১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ইহা ধরিয়াছেন। সেইজন্য ইহার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা চলে না। সালবেগের পদ হইতে বুঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকলবাসীর পক্ষে ব্রজবুলিতে পদ লেখা অসম্ভব ছিল না।

গোপালভট্ট দক্ষিণদেশের লোক। তাঁহার ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ পদকল্পতরুতে (১০৮৮, ২৮৩৩) পাওয়া যায়। আজও ব্রজমণ্ডলে একাধিক মাদ্রাজী ভক্ত দেখিয়াছি যাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া প্রথমে বুঝিতে পারি নাই যে বাংলা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ও তাঁহার পরিকরদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিয়া গোপালভট্টের পক্ষে ব্রজবুলিতে পদ লেখা কিছুমাত্র বিস্ময়-জনক নহে। কৃষ্ণের সহিত রাধা কুঞ্জে মিলিত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাদের রূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া গোপালভট্ট বলিতেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
পুছত বাত অতি নিবীড়
প্রেমতরঙ্গে ঢরকি পড়ত
কমল মধুপ সঙ্গ হে। —তরু. পদসং. ১০৮৮

ভীড় শব্দের অর্থ সম্মিলিত। রাধা ও কৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গে ও বাহুতে বাহুতে সম্মিলন হইয়াছে। তাঁহারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্তা বলিতেছেন। প্রেমের ঢেউয়ে যেন উছলিয়া পড়িতেছে কমলমধুপানে রত ভ্রমর। এই ধরনের ভাষা ব্রজমণ্ডলের পূরবিয়া ও পশ্চিমিয়া ভক্তদের বোধগম্য হইবে বলিয়া গোপাল-ভট্ট মনে করিতেন। তিনি ঐ বিষয়েই অন্য একটি পদে লিখিয়াছেন—

মধুরিম হসে বসনতে ঝাঁপি শোহত
মেহতে জেহু বিজুরি গোপ্যো।
কণ্ঠহি লোলত মোতিম হার
কনক-মুকুরে জেহু তারক রোপ্যো॥ —তরু. পদসং. ২৮৩৩

শ্রীরাধার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তিনি কিন্তু তাহা নীল শাড়ি দিয়া ঢাকিতেছেন। নীল শাড়ি যেন মেঘ, আর হাসিটুকু যেন বিদ্যুৎপ্রভার মতন শোভা পাইতেছে। তাঁহার গলায় যে মুক্তার হার দুলিতেছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যে সোনার দর্পণে যেন তারকাবলী রোপিত হইয়াছে। রাধার রঙ সোনার মতন, তাঁহার কান্তি দর্পণের মত স্বচ্ছ।

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র রঘুনাথ দাসই পশ্চিমবঙ্গের খাঁটি অধিবাসী। কিন্তু তিনিও মঙ্গল আরতি লিখিবার সময় এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা আমাদের কাছে এখন দুর্বোধ্য হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভক্তদের নিকট সহজবোধ্য ছিল।

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম কালকি।
আরতি কিয়ে মদন গোপালকি ॥ —তরু. পদসং. ২৮৬৯

জন্ম বা জীবনের সকল সন্তাপ দূর হয়, কালরূপ যমের আহ্বান (তলপ, আরবী তলব্ শব্দ হইতে; সংস্কৃত তল্প বা শয্যা ধরিলে কোন মানে হয় না) ঘুচে। ঐ পদে রঘুনাথ দাস গোলাপের ফার্সি প্রতিশব্দ গুলাব ব্যবহার করিয়াছেন—

চরণ-কমল পর নূপুর বাজে
আজরি কুসুম গুলাবকি।
সুন্দর লোল কপোলক ছবি সোঁ
নিরখত মদন গোপালকি ॥

কিন্তু দাসগোস্বামী শ্রীরাধার যে রূপবর্ণনার পদ লিখিয়াছেন তাহাতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দরাজি প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবলমাত্র 'যেন', 'জিনি' 'মাঝ' 'তাহে' এবং 'পহুঁ' এই পাঁচটি বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দুই চরণ নমুনা দিতেছি—

উরজ-লম্বি বেণি মেরু পর যেন ফণি
অভরণ বহু মণি গজ-গমনী।
বিণা পরিবাদিনি চরণে নূপুর-ধ্বনি
রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥ —তরু. পদসং. ২৪৬৭

এই দুইটি উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তগণের নিকট তাঁহার পদকে বোধগম্য করা—কোন ভাষাতাত্ত্বিক-রীতি অনুসরণ করা নহে।

ঐ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে গাহিবার জন্য ত্রিশটি ক্ষণদায় বিভক্ত যে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহাতে অধিকাংশ পদই বাছিয়াছিলেন ব্রজবুলিতে অথবা সংস্কৃতে লেখা পদ হইতে। তিনি নিজের লেখা ৫৩টি পদ উহাতে স্থান দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির ভাষাই ব্রজবাসীদের বোধগম্য। যথা—

এ সখি! অব সব পরীখণ ভেলি।
তুহুঁ নবপ্রেম-অমৃত-রস বেলী ॥
লাগলি শ্যাম-তমালকো অংস।
কুল ভয়ো সব জগ অবতংস ॥

এ দোহুঁ মিলন কবহুঁ না ছোটে।
মূঢ়কো যতনে বেলী বরু টুটে ॥ —ক্ষণদা. ১৩।৪

সখি! এখন সব রকম পরীক্ষা করা হইল, তুমি নূতন প্রেমরূপ রসামৃতের বেলী, বল্লী বা লতাস্বরূপ। তুমি শ্যামরূপ তমালের স্কন্ধে জড়িত হইলে; তাহাতে সমস্ত জগতের শিরোভূষণ হইলে। এ দুইয়ের মিলন কখনও ভঙ্গ হয় না। মূর্খলোকে যদি চেষ্টা করে তাহা হইলে লতা বরং ছিঁড়িয়া যায়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর দেখাদেখি মনোহর দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পশ্চিমা ভক্তদের জন্য একখানি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সঙ্কলন করেন। উহা ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে রাধাকুণ্ড কুসুমসরোবর হইতে বাবা কৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ৪৪ জন কবির ২২৩টি পদ আছে—তন্মধ্যে হরিবল্লভ উপনামধারী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ৬টি পদ ধরা হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা মনোহর দাসজীর ২১টি পদ আছে। ঐ মনোহর দাস 'অনুরাগবল্লী'র রচয়িতা মনোহর দাসের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। এই অনুমান সত্য, কেননা গ্রন্থের অধিকাংশ গৌরচন্দ্রিকা তাঁহার রচনা। সেগুলির মধ্যে বাঙালীত্বের সন্ধান মেলে। যথা—

নিশিদিন ইহৈ সোচ মেরে উর।
কৌন কাজ ব্রজরাজ কুঁবর বর ধার্য্যো গৌরে কলেবর॥
সুখকো পরম সদন বৃন্দাবন পরিজন নিপট সনেহ।
সো সুখ ছাড়ি বসত নদিয়াপুর সমঝ পরত নহিঁ এহ ॥ —ক্ষণদা., ৫।৪

এখানে ছোড়ি বা ছোড়কে শব্দের পরিবর্তে লেখক খাঁটি বাংলা 'ছাড়ি' ব্যবহার করিয়াছেন। উহাতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ব্রজভাষার পদ এইরূপ দেখা যায়—

হরি হরি কৌন কৃপা রস এহ।
ধন্য গৌড় ধরণী জহাঁ লোকন অবলোকত হরি গৌর দেহ ॥
বিনহি জতন, নব প্রেম রতন, সো সবহিন কে যহাঁ ভয়্যো রোহ।
সবহী রসিক সবহী হরি বল্লভ রাজত যহাঁ পরস্পর নেহ ॥ —ক্ষণদা. ৯।১

চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতির প্রবর্তিত রীতিতে রচনা করিয়া সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। তিনি শুধু বাঙালীর জন্য পদ লিখিতেন না। ব্রজের বৈষ্ণবদের আস্বাদনের জন্য তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পদ রচনা করিয়া পাঠাইতেন। ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত শ্রীজীবের সংস্কৃত পত্র হইতে জানা যায় যে বৃন্দাবনে তাঁহার পদের খুব সমাদর হইত। শ্রীজীব গোবিন্দদাসকে লিখিতেছেন—সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্তামহে, পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্তব্যং' অর্থাৎ—সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাত্মক আপনার স্বরচিত গীতসকল যাহা পূর্বেই পাঠাইয়াছেন সেই অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। পুনরায় নূতন নূতন তাদৃশ গীতের আশায় আবার অতৃপ্তি বোধ

করিতেছি। অতএব সে বিষয়ে অবহিত হইবেন। শ্রীজীব নিশ্চয়ই একা একা পদ আস্বাদন করিতেন না। পদগুলি গান করিবার জন্যই লেখা হইয়াছিল এবং শ্রীজীব ভক্তদের সঙ্গে গানই শুনিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে বুঝা যায়, গোবিন্দদাস কবিরাজ কেন বিদ্যাপতির ভাষা অনুসরণ করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ যে কারণে সংস্কৃতে বই লিখিয়াছিলেন, গোবিন্দ কবিরাজও সেই জন্য তথাকথিত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস ছিলেন ভাষার যাদুকর। তিনি ভাষাকে অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ খেলাইতে পারিতেন। আমাদের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' নামক বই বাহির হইয়াছে তাহাতে ৩৫টি চিত্রগীত (১১৪-১৪৪ সংখ্যক পদ) সংগৃহীত হইয়াছে। 'অবনত আনন আঁচরে গোই' 'কামিনি কানু কহল কত মোর', 'কুন্দন-কনক-কলিত কর-কঙ্কণ' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি মোহন সুরত-সন্দেশে' এবং 'হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই' দিয়া ঐ চিত্রগীত পর্যায় শেষ হইয়াছে। ভাষার কারুকার্যের চাপে গীতগুলির মধ্যে চিত্র হয়তো ভাল ফুটে নাই। কিন্তু কবি যখন বলেন—

মধু-গুড়-লোভিত বাউল চীত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥

তখন কৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গলের পেটুকপনা মানসচক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। বেচারা একটু মধু বা গুড় জোগাড় করার জন্য নিজের পৈতাটিও বন্ধক দিতে রাজি। শ্রীচৈতন্যের ভাব-বিচিত্র জীবনের আলেখ্য দুইটি কালির আঁচড়ে কেমন আঁকিয়াছেন—

সঘনে রোদন সঘনে হাস।
আনহি বরণ বিরস ভাব॥ —পদসং. ১৫

অথবা

নটন ঘটন টভ পেল ভোর।
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল॥
রোয়ত হসত ধরণি খসত।
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥ —পদসং. ১৭

খাঁটি বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ মিশাইবার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল গোবিন্দদাসের। তিনি লিখিয়াছেন—

ঘুমে আলপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥

বিহারের এক পণ্ডিত গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবি প্রতিপন্ন করিবার জন্য একখানি বই লিখিতে যাইয়া ঐ পদের 'ঘুমে' শব্দের মানে করিয়াছেন—ঘুমতা ফিরতী

শ্বায়—পায়চারি করিতে করিতে কত রকমের কথা বলে। 'ঝুমে' মানে যে নিদ্রায় বা স্বপ্নে তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই।

গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামদাস তাঁহার পিতামহের রীতি অনুসরণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখা 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে তিনি স্বকৃত অনেকগুলি পদ ধরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য অনেক পদ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। 'রসবিলাসবল্লী' নামক রাধাকুণ্ডের পুথি[১] হইতে তাঁহার একটি অপ্রকাশিত পদ নীচে দিতেছি—

উতপত দেহ, থেহ নাহি বান্ধই, অনুকূল, প্রতিকূল ভান।
সঘন নিশ্বাসে নিমিখ নাহি লোচনে, কি ভেল পাপ পরাণ॥
সজনি শুনইতে মানবি আন।
নিকসল চারু চিত্রপটে হট সঞে এক মূরতি অনুপাম॥
অভিনব শ্যাম জলদ নবকৈশোর মরকত জিনিঞা স্থঠান।
বরিহা মিলিত ললিত নবমালতি ভালে চূড়া চিকণ বনান॥
মঞ্জু মুখ হেরি ঢালি নয়নাঞ্জন হানল ভাঙু সন্ধান।
তব্ ধরি উনমত হৃদয় থির নহ ভাল মন্দ একু না জান॥
অনল দহন ঘন, চাঁদ কিরণ যেন, হিমকর অনল সমান।
হেন বিপরিত রূপ হেরি ঐছন ঘনশ্যাম দাস পরমাণ॥

চিত্রপটে শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া রাধা উন্মাদিনী হইয়াছেন, তাহারই বর্ণনা। উতপত—উত্তপ্ত; থেহ—স্থৈর্য বা ধৈর্য; আন—অন্যরকম; হট সঞে—জোর করিয়া অথবা হঠাৎ; বরিহা—বই; ভাঙু সন্ধান—ভ্রূভঙ্গী করিয়া কটাক্ষ; তব্ ধরি—সেই হইতে; পরমাণ—প্রমাণ বা সাক্ষী।

ঘনশ্যাম পাণ্ডিত্যপূর্ণ রসিকতার সহিত রাধাকৃষ্ণের এক বিচিত্র আলাপ আর একটি অপ্রকাশিত পদে লিখিয়াছেন—

কো ইহ পুনপুন করত হুঙ্কার।
'হরি হামি', জানি, না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরি কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল মৃগরাজ॥
'সোহরি নহোঁ মধুসূদন নাম।'
চলু কমলালয় মধুকরী ঠাম॥
'এ ধনি সে নহ ঘনশ্যাম।'
তনু বিনু গুণ কিয়ে কহেঁ নিজ নাম॥

---

১ এই পুথি ব্রজমণ্ডলের অদ্বিতীয় কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত হরিদাস গায়েনজীর নিকট শ্রীরাধাকুণ্ডে আছে।

'শ্যাম মুরতি হাম, তুহুঁ কি না জান।'
তারাপতিভয়ে বুঝি অনুমান।
ঘর-মাহা দীপ রতন উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আঁধিয়ার॥

পরিচয়-পদ যব সব ভেল আন।
তবহি পরাজয় মানল কান॥
তৈখনে জাগল মনমথ সূর।
অব ঘনশ্যাম-মনোরথ পূর॥

রাধা ঘরের মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কে এখানে বারবার হুষার করছে? কৃষ্ণ বলিলেন, 'আমি হরি'। রাধা বলিলেন—'তা জানি, আর প্রচার করতে হবে না। হরি তো সিংহ, তিনি হঠাৎ গিরি-কন্দর ছেড়ে আমার ঘরে এলেন কেন?' তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 'সুন্দরি! আমি মধুসূদন।' রাধা বলেন, 'ও তাই বুঝি। বেশ, মধুসূদন তো ভ্রমর, তিনি কমলের বনে ভ্রমরীর কাছে যান।' কৃষ্ণ তখন বলেন, 'আরে উলটা বুঝছ কেন? আমি নবঘনশ্যাম।' রাধা উত্তর দেন, 'মেঘের আবার মুখ আছে না কি? সে আবার নিজের গুণ ও নাম বলে কি করে?' কৃষ্ণ বলেন, 'আরে মেঘ নয়, আমি শ্যামমূর্তি।' রাধা বলেন, 'তাই বুঝি চাঁদের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ানো হচ্ছে? কিন্তু আমার ঘর তো রতন-দীপে উজ্জ্বল; তুমি আঁধারস্বরূপ, ঘরে ঢুকবে কেমন করে?' অবশেষে যখন উভয়ের মিলন হইল তখন কানাই হাসিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের মনে বীরমন্মথ জাগিল; তখন ঘনশ্যামের মনোরথ পূর্ণ হইল। ঘনশ্যাম শব্দ এখানে দ্ব্যর্থক, কবিকে ও কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে।

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস পূর্ববর্তী কবিদের বন্দনায় লিখিয়াছেন যে ঘনশ্যাম ও বলরাম 'কবি-নৃপ-বংশজ।' এখানে কবি-নৃপ মানে কবিরাজ ও কবিদের রাজা গোবিন্দদাস। ঘনশ্যাম যে গোবিন্দদাসের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র—একথা তিনি নিজেই গোবিন্দমঞ্জরীতে বলিয়াছেন। কিন্তু বলরামের সঙ্গে গোবিন্দদাসের কি সম্বন্ধ তাহা জানা যায় না। শ্রীখণ্ডের একজন লেখক বলেন যে বলরাম কবিরাজ ছিলেন গোবিন্দদাসের ভাগিনেয়, কিন্তু ভাগনে তো তাঁহার নিজের বংশের লোক হইতে পারেন না; তখনও তো স্বগোত্র-বিবাহের প্রচলন হয় নাই। বলরাম দাস নামে যে একাধিক কবি আছেন তাহা কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বলরামের কোন্ পদ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৯৭৮ সংখ্যক পুথিতে আছে 'বলরাম কবিরাজ ঠাকুরের পদাবলী' উহাতে তাঁহার ২০টি পদ আছে। সবগুলিই গোবিন্দদাসের কবি-শৈলী অনুসরণ করিয়া লেখা। প্রথম পদটি হইতেছে রূপালসের—

শ্যামর নাগর বর মদ কুঞ্জর
মাতল রস উনমাদে।
লুনি পুতলি জনু কুওরি সুনায়রী
মুরছলি অতি অবসাদে॥
হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গেহা।
নিধুবন-সমর পরাভব কাতরি
শুতলি ডুবরি দেহা॥ ইত্যাদি

অন্য ১৯টি পদও বিলাসের। কিন্তু নিত্যানন্দের পরম ভক্ত এক কবি বলরামদাস ছিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় লেখা হইয়াছে—

সঙ্গীত কারক বন্দোঁ বলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস॥

এই কবির গোষ্ঠের পদগুলি সুবিখ্যাত। সাহিত্য-পরিষদের পুথির ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে শাদা বাংলায় লেখা সখ্য ও বাৎসল্য-রসের পদগুলি নিত্যানন্দের ভক্ত বলরামদাসের লেখা; আলঙ্কারিক ভাষায় ব্রজবুলিমিশ্রিত সম্ভোগের পদগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশোদ্ভূত বলরাম কবিরাজের। প্রথমোক্ত বলরামদাসের একটি পদ ভক্তিরত্নাকর (পৃ ৮৩৭) হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভাষার নমুনা দিতেছি—

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল॥
বিশাল হৃদয়ে গজ-মুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার॥
ছন্দ-বিছন্দে কত জানে অঙ্গিভঙ্গি।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু তানে।
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ানে॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরি ছটা পড়য়ে দশনে॥
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙ্গা ওট খানি হাস।
ওরূপ হেরিয়া কান্দে বলরামদাস॥

পদটিতে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার ছাপ আছে। নিমাই পণ্ডিত যে ভাল গান করিতে পারিতেন তাহার বর্ণনাও এখানে পাওয়া যায়। এই ধরনের লেখার সহিত কবিরাজ বলরাম ঠাকুরের আদিরসে ভরপুর পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে আধুনিক পদসংগ্রহ-গ্রন্থের সম্পাদকদের কৃপায়।

আমার মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ কীর্তন-সম্রাট্‌ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর সংগ্রহ

হইতে নিত্যানন্দভক্ত বলরামদাসের একটি অপ্রকাশিত পদ তুলিয়া তাঁহার কথ্য ভাষায় রচনার নমুনা দিতেছি—

কি কর মায়ের কোলে ভেয়ারে কানাই।
হৈল অধিক বেলা চল গোঠে যাই।
রাজভোগের ভোগী হৈয়া বসিয়াছ ঘাটে।
কে তোমার নফর আছে ধেনু রাখে মাঠে॥
শুনিয়া গোঠের কথা বলে নন্দরাণী।
দুধের ছাওয়াল মোর এই নীলমণি॥
কনেড়া কুসুম যিনি ননী-ছাঁকা তনু।
কেমনে ফিরিবে বনে ফিরাইবে ধেনু॥
রাম কানু পানে ঘন চাহে নন্দরাণী।
বলরামদাস তঁহি কাতর পরাণী॥

এই যে শাদামাঠা পরান-কাড়া ভাষা ইহাই শ্রীচৈতন্য-যুগের বিশিষ্ট ভাষা। চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙালীর মনে ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল। তখন নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, রামানন্দ বসু, শঙ্কর ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত, প্রভৃতি কবি যে-ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কষ্টকৃত প্রয়াস বা কৃত্রিম আলঙ্কারিক প্রয়োগ ছিল না। প্রাণের কথা হৃদয়ের দুয়ারে যাইয়া ঘা মারিয়াছে। যাঁহারা পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিতে যাইয়া কেবলমাত্র ব্রজবুলির পদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবিদের রচনার প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাপতির রীতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের রচনাশৈলী অধিক অনুসৃত হইয়াছিল। কয়েকটি উদাহরণ দিলে উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে।

গোবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্য-যুগের প্রথম বৈষ্ণব কবি। গয়া হইতে ফিরিবার পর গৌরাঙ্গ প্রেমভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বাংলা ও আসাম হইতে ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট চলিয়া আসেন। কিন্তু ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি পূর্বদেশ—যাহা বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান—(অধুনা বাংলাদেশ—প্র.) সেইখানে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে একমাত্র গোবিন্দ ঘোষই তাঁহার সম্বন্ধে পদ লিখিয়াছেন। পদটিতে ব্রজবুলির কোন চিহ্ন নাই—

গোরা গেল পূর্বদেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলপয়ে কত পরকার।
কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥ ইত্যাদি —তরু. পদসং. ১৫৯৭

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের পদের সহিত ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি

চক্রবর্তীর পদ অনেকেই এক বলিয়া ধরেন। কিন্তু শেষোক্ত কবি নিজেই নীচে লিখিত পদটি ধরিয়া লিখিয়াছেন যে 'শ্রীনরহরি সরকার ঠকুরস্য গীতমিদং'—

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহু যমুনার ভনে॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥ ইত্যাদি —তরু. পদসং. ২১২২

এইরূপ ভাষায় নরহরি-ভণিতায় শ্রীগৌরাঙ্গের ভাববর্ণনামূলক অনেকগুলি পদ (যথা, ৩০৭, ৩১৬, ৭৯৯, ৮২০, ১৬৪৩, ২২৫৯) পদকল্পতরুতে আছে। সেগুলি নরহরি সরকারের রচনা, নরহরি চক্রবর্তীর নহে। চক্রবর্তীর রচনায় এমন সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি নাই, এমন ভাবের ব্যঞ্জনাও নাই। কেবলমাত্র প্রভুর পরিবর্তে পহু শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এই সব পদকে ব্রজবুলির পদ বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের যুগে ধামালী বা ঢামালি ধরনের রঙ্গরসের পদও কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন গোবিন্দ আচার্য, যাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় বলা হয়—

গোবিন্দ আচার্য বন্দোঁ সর্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী'তে শ্রীগোবিন্দ আচার্য ঠাকুরের রচনা বলিয়া নীচে লিখিত পদটি ধরিয়াছেন—

ঘন ঘন বরিখে বিজুরি ললপে।
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে॥
ছোড় ছোড় অঞ্চল নিলজ মুরারি।
লাজ নাহি তোর আস্তে হাম পর নারি॥
তোড়লি কাঁচলি ছিঁড়লি হার।
নখরে বিদারলি পয়োধর ভার॥
তা সঞে ঢাম'লি করহ বনআরি।
তুহু চঞ্চল বড় সো তৈছে নারি॥ —রসকল্প. পৃ ১৫৬

ঐ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে হোলি খেলাতে 'ঢামালি কথন বহু হয়।'

ধামালীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় লোচনের পদে। লোচন নরহরি সরকারের শিষ্য। একটি ধামালী রামগোপাল দাস তুলিয়াছেন—

কোন দেশে ছিলা আগো মাগো।
মোর বোল বুলিতে তোমার মুখে পড়িত লালা
এবে কোন কাজে নাহি লাগো॥
কুলের বৌহারি মোরা বাড়ীর বাহির নহি
কালা দেখিতে তিন বেলা।

আচট ঘুমের বেলে শয়ন স্বামীর কোলে
স্বপনে উঠিয়া দেখি কালা॥
পাঁকের পুকুরে তুমি পরকে নামায়াছ
পাখানি তোমার নাহি তিতে।
লোচনে বোলেন দিদি ঐ দুঃখে কান্দি আমি
উচিত বুঝাও তুমি চিতে॥ —রসকল্প. পৃ ১০০

'আচট ঘুম' কি পদার্থ বুঝা গেল না। অন্য কোন অপ্রচলিত শব্দ ঐ পদে প্রয়োগ করা হয় নাই। ন্যাকামির অপরূপ দৃষ্টান্ত নীচের পদটিতে পাওয়া যায়—

তোমরা নাকি বল আমি কানুর সনে আছি।
এ বোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি॥
যে দিগে কানুর ঘর সে মুখে না বসি।
সতী সাধে সে মুখের বায়ু না পরশি॥
কে ধরিল হাতে নাতে কে দেখিল কোথা।
মিছামিছি বিড়ালিনী তোলায় নানা কথা॥
না জানিয়া না শুনিয়া এ বোল বলে কে।
পুত-খাইনির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে॥
এ রূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া থোব।
মিছা কথা লাগি মাগো কত আমি স'ব॥
লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর।
শ্যাম নাগর লয়ে তুমি সুখে কর ঘর॥

—১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পদকল্পলতিকা, পৃ ২৮

বাংলাদেশের কবিকুলের মধ্যে জ্ঞানদাসই সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়া তিনি ঐ পথ ছাড়িয়া চণ্ডীদাসী ধরনে পদ রচনা আরম্ভ করেন। বিদ্যাপতির সার্থক অনুসরণ করেন তাঁহার পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাসের প্রথম যুগের ব্যর্থ অনুকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদ্যাপতি নায়িকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

থির নয়নে অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয় থল লালিম দেল॥

জ্ঞানদাস ইঁহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

উলসল উরথল অব ভেল রে।
আয়ত হোয়ত নয়ান রে॥

বিদ্যাপতির রাধা যখন নব-তারুণ্য লাভ করিলেন, তখন—

কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥

কেলিক রভস যব শুনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কাণে॥

জ্ঞানদাস উহার অনুকরণে লিখিয়াছেন—

কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহিঁ যাব॥

বিদ্যাপতিতে দেখি কুট্টনী নায়িকাকে বুঝাইতেছে যে মালতী ফুল ফুটিলেই ভ্রমর তাহার নিকট আসিবে, সে নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াও মালতীর মধু পান করিতে চায়—

রসমতি মালতি পুনুপুনু দেখি।
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি॥

এই ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তিটি জ্ঞানদাসের পদে শাদামাঠা রূপ লইয়াছে—

তুহু যে সুচেতনি বুঝ সব কাজ।
মধুকর বিনু নাহি মালতী সাজ॥

এই ধরনের ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়িয়া জ্ঞানদাস যখন স্বকীয় প্রতিভার উৎসের সন্ধান পাইলেন তখন তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইল—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তর বিদরে কি জানি কি করে পরাণ॥

রূপ যেন প্রবহমান তরল পদার্থ। শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে কোন দীঘি বা নদীর তুলনা দেওয়া চলে না; কূলকিনারা দেখা যায় না এমন সমুদ্রের সঙ্গে শুধু তাহার উপমা দিতে হয়। সেই সমুদ্রে রাধার চোখ একেবারে ডুবিয়া রহিল; তাহার আর উঠিবার সাধ্য নাই। এদিকে আবার সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন সেও শ্রীকৃষ্ণের যৌবনেব বনে প্রবেশ করিয়া পথ ভুলিয়াছে; আর সে বনের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। চোখ এবং মনের যখন এমন অবস্থা তখন রাধা ঘরে ফিরিবেন কিরূপে? তাই ঘরে যাইবার পথ আর ফুরায় না। ফিরিয়া ফিরিয়া কানাইয়ের পানে চাহিতে থাকিলে আর পথ শেষ হয় কি করিয়া? রাধার হৃদয় তো বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; প্রাণ থাকিবে কি যাইবে তারও ঠিক নাই। রাধা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না তাহাকে কৃষ্ণের রূপই টানিতেছে, কি গুণে মন বাঁধা পড়িয়াছে। এত সূক্ষ্ম বিচার করিবার মতন শক্তি কি আর রাধার আছে, তাহার 'মুখেতে না ফুরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে'। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে চিত্রধর্মী কাব্যের এমন নিদর্শন আর পাওয়া যায় না।

পদকল্পতরুর সঙ্কলনের পর তিনজন প্রতিভাবান কবির অভ্যুদয় হয়। ইহাদের

মধ্যে প্রথম জগদানন্দ। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সাতটি মাত্র পদ ধরিয়াছেন— সেগুলিকে জগদানন্দের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান বলা যায় না। মধুর শব্দচয়ন করিয়া অপূর্ব ঝঙ্কার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগদানন্দের অসাধারণ। কুঞ্জভঙ্গের পদে তিনি লিখিয়াছেন—

তড়িত-জড়িত, জলদ ভাঁতি।
দুহুঁ শুতি সুখে, রহল মাতি॥
জিনি ভাদর, রস বাদর।
পরমাদরে শেজে।
বরজ কুলজ জলজ-নয়নি
ঘুমল বিমল কমল-বয়নি
রতি লালিস ভূম-বালিশ
আলিস নাহি তেজে॥

ভাদ্রমাসের অশ্রান্ত বর্ষণকেও হারাইয়া দিয়াছে তাঁহাদের মিলনের আনন্দের রসধারা। শয্যায় তাঁহারা পরম আদর ভরে শুইয়া আছেন। রাধা ব্রজকুলের কমলনয়নী, তাঁহার মুখখানি বিমল কমলের মতন। তিনি রতিশ্রমে এমন ক্লান্ত যে বালিশে মাথা দিবার পর্যন্ত উদ্যম নাই, দয়িতের বাহুকে বালিশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এমন অকরুণ বলে অরুণ উদিত হইলেও তাঁহার আলস্য আর ভাঙ্গিতেছে না। গদ্যানুবাদের নীরস বাণীর সহিত কবির পদ মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে তিনি ভাষার কেমন জাদুকর।

শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর নামে দুই কবি-ভ্রাতাও ভাষার কারুকার্য যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুথিতে শশিশেখর ভণিতায় আদালতের ভাষায় লিখিত শ্রীকৃষ্ণের এক খাতকনামা পাইয়াছি—

ইয়াদি কিধৎ গুণসমুদ্র শতসাধু শ্রীরাধা।
শত উদারস্য চরিত তস্য পুরাহ মনের সাধা॥
তস্য খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরি।
কস্য কার্য পত্রমিদং লিখি লেহ সুকুমারি॥
ঠামহি তব প্রেমদুর্লভ লই নাম কণ্ঠ করি।
ইহার লভ্য পাইবে ভব্য প্রেম অখিল ভরি॥
একুণে তিন বাণ্ডা পূরব পরিশেষে কলিযুগে।
এই করারে খত লিখি দিলাম ইসাদি মঞ্জরি ভাগে॥
বসন্ত আগর তারিখ দ্বাপর শশিশেখর লেখনি।
করুণা কর রাধাপ্যারি এই খত লিখি দেওনি॥ —পদসং. ১৭৫০

এইপদে উর্দু-ফার্সি বয়ানের সঙ্গে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও ব্রজবুলির অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈষ্ণবপদাবলী (চয়ন)-গ্রন্থে সংস্কৃত বুলি মেশানো একটি পদ যদুনন্দন ভণিতায় ধরা হইয়াছে :

ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে
যাঁহা দরশন পাওয়ে।
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরপুর আওল ব্রজরমণা॥

—বৈ. পদা.—ক. বি. ৮ম সং. পৃ ৯৭

যদুনন্দন দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য। তিনি এই ধরনের পদ লিখিলে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, সঙ্কীর্তনামৃত, কীর্তনানন্দ, পদকল্পতরু ইত্যাদি কোন না কোন সঙ্কলন-গ্রন্থে ইহা ধৃত হইত। নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সঙ্কলিত পদামৃতমাধুরীতে পদটি গোকুলানন্দের ভণিতায় দেখা যায় (৪।৮৭ পৃ)। উহার পাঠ অনেকটা পৃথক—

ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুঁড়ব হাম পুরি প্রত্যেকে যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা॥

এই পাঠ বিশ্ববিদ্যালয়-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অনেক ভাল মনে হয়। যাহা হউক চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পদাবলী যে কত বিচিত্র ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহার একটু পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

পঞ্চদশ শতাব্দী

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চারজন পদকর্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু গুণরাজ খান্ এবং মাধবেন্দ্রপুরী। বিদ্যাপতি ২৯১ লক্ষ্মণ সংবতে বা ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে শিবসিংহের রাজ্যকালে কাব্য-প্রকাশবিবেকের অনুলিপি করাইয়াছিলেন (J. A. S. B. ১৯১৫, পৃ ৩৯২)। শিবসিংহের রাজ্যকালে তিনি অন্ততঃ দুইশত পদ রচনা করেন। বিদ্যাপতির অনেক ভালো ভালো পদ শুধু বাংলাদেশেই পাওয়া যায়, মিথিলায় বা নেপালে সেগুলি পাওয়া যায় না। সেগুলির ভাষার সহিত মিথিলা বা নেপালে প্রাপ্ত পদের ভাষার পার্থক্য অনেক; এমন কি ভাবেরও বৈষম্য গুরুতর। মনে হয় বিদ্যাপতির পদ গাহিবার সময় বাঙালীরা তাহাতে এমন সব পরিবর্তন করিয়াছিলেন যাহাতে উহা বৈষ্ণবীয় ভাবের হয় এবং সহজবোধ্যও হয়। একজন বাঙালীও বিদ্যাপতি নাম লইয়া অনেকগুলি সম্ভোগের ও অন্যান্য বিষয়ের পদ লিখিয়াছেন।

যে চণ্ডীদাসের পদ এখানে উদ্ধৃত হইল তিনি বিশেষণহীন চণ্ডীদাস। একজন চণ্ডীদাস এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে অন্যান্য চণ্ডীদাস তাঁহাদের নামের সহিত বড়ু, দ্বিজ, আদি, দীন, প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষণহীন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন।

মালাধর বসু শ্রীচৈতন্যের জন্মের কিছুদিন পূর্বে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। তাঁহার উপাধি ছিল গুণরাজ খান্। তাঁহার বংশোদ্ভব সত্যরাজ খান্ ও রামানন্দ বসু প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরু। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাকে 'ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর' (১।৯) বলিয়াছেন। তাঁহার প্রেম এমন গভীর ছিল যে মেঘ ও ময়ূরের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিলে তিনি মূর্ছিত হইতেন। বৈষ্ণবপদাবলী যে বৈষ্ণবজনের জীবনের কাব্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার সূত্রপাত এইখান হইতে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে জীবনের উপাসনার ধন করা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের সুগভীর ভাবানুভূতি পদাবলীকে যেভাবে ভাব-সমৃদ্ধ করিয়াছিল তাহার অভাব এই দুই কবির রচনায় পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চদশ শতকের লেখা আক্ষেপানুরাগ, অভিসার ও রাসলীলার পদের সহিত ঐ সব বিষয় লইয়া রচিত ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর তুলনা করিলে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর মহাজনগণ মঞ্জরীভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাধা-কৃষ্ণের, বিশেষ করিয়া শ্রীরাধার সেবা ভণিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ভাবটি দুষ্প্রাপ্য।

প্রথম স্তবক

আক্ষেপানুরাগ

১. কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশি-নিশাস-গরলে তনুভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব-তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নিবি-বন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥ —তরু. ৮৩১

টীকা: বাঁশি-নিশাস-গরলে—বংশী যেন সাপ, তাহার নিঃশ্বাসে যেন গরল আছে। হঠসঞে পৈঠয়ে—জোর করিয়া প্রবেশ করে। তৈখনে বিগলিত ইত্যাদি—কানের ভিতর ঢুকিতেই আমার দেহ এবং লজ্জা সব শিথিল হইয়া যায়; মন রসে ভরিয়া ভরিয়া উঠে। দেহে রোমাঞ্চ হয়, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া যায়। এই ভাব যেন কেহ দেখিতে না পায়।

মন্তব্য: এই পদটি মিথিলায় ও নেপালে পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির মূল রচনার উপর বৈষ্ণব ভক্তেরা কিছু সংযোগ করিয়াছেন কি না বলা যায় না।

২. বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন।
শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সবে নাটের গুরু কালা॥ —তরু. ৮৩০

টীকা: পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে—তৃষ্ণা পাইলে হরিণী নদী, সরোবর বা ঝরনায় জল খাইতে যায়, আর সেই সময়ে ব্যাধ তাহাকে বাণ মারে।

রাধাও রসের পিপাসায় বাঁশীর শব্দ শুনিয়াছেন এবং তাহাতেই প্রাণ যায়-যায় অবস্থা হইয়াছে। মুনি ভোলে মন—মনের উপর যাঁহাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তাঁহারাই মুনি। কিন্তু এহেন ব্যক্তিরাও বাঁশীর শব্দ শুনিয়া বিমোহিত হন।

৩. ধরম করম গেল গুরু-গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরিত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মন করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু-পরিবাদ হৈল পুড়্যা মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল অন্তরে॥
জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥ —তরু. ৮৮৬

টীকা: গুরু-গররিবত—গুরুশ্রেণীর গৌরব; কুলগৌরব। গরবিত শব্দের সাধারণ অর্থ গর্বিত বা মান্য-সম্পর্কে-যুক্ত। চরচাতে—চর্চায়। পরিবাদ—কলঙ্ক। সামাইল—সান্ধাইল, প্রবেশ করিল।

৪. সই ডাকিয়া শুধাইতে নাই, প্রাণ আনছান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম, মোরা হৈলাম দোষী॥
বাহিরে বাড়াইতে লোক চরচা, বিষম শাইল ঘরে।
পিরিতি করিয়া জগত বৈরী, আপন বলিব কারে॥
অনেক দোষের দুষিনী হইলে, না ছাড়ে আপন অঙ্গ।
তোমরা পরাণের বেথিত আছিলা, জীবনে মরনে সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন গোকুলের কান, সভাই আপনা বলে।
মো পুনি ইছিয়া নিছিয়া লইলুঁ, অনাদি জনম ফলে॥
রাধা বলি আর ডাকি না শুধাও, এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস বোলে সভারে পাইবে, বন্ধুয়া আপন হৈলে॥
—বরাহনগর ৬ (৬/ ৩৬এর পাঠমূলে দেওয়া হইল; ইহার সহিত তুলনীয় তরু. ৮৪৩, কী ৩০৪, নী ২৭ প্রদত্ত পাঠ

টীকা: শাইল—শল্য, শেল। না ছাড়ে আপন অঙ্গ—দেহের কোন অঙ্গ খারাপ হইলেও কেহ ফেলিয়া দেয় না; রাধা যেন সখীদের অঙ্গতুল্য। ইছিয়া—ইচ্ছা করিয়া। নিছিয়া লইলুঁ—অভিনন্দন করিয়া লইলাম।

৫. ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিলাম ছাই।
জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই॥
না দিলে রসিক মূঢ় মুরুখের সনে।
এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখাজোখা॥
ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥ —তরু. ৮৫০

টীকা : না দিলে রসিক ইত্যাদি—হে বিধাতা, তুমি রসিক ব্যক্তিকে না দিয়া আমাকে এক মূঢ় মূর্খের সঙ্গে দিলে।

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি·যাই তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ॥ —তরু. ৮৩৪

৭. পিরিতি সুখের সায়র দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল।

দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জীয়ল-মাছে।
কুল-পানিফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি ॥ —তরু. ৮৭২

টীকা : জলের শিহালা—জলের শেওলা। পড়সী জীয়ল-মাছ—প্রতিবেশীরা কলঙ্ক রটায়, তাহাদের কথায় মনে হয় যেন হাতে জিয়ল-মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছে। জিয়ল-মাছের কাঁটায় খুব ব্যথা লাগে। কুল-পানিফল—কুলধর্ম যেন পানিফল; পানিফলের কাঁটাও খুব যন্ত্রণাদায়ক। ছানিয়া—ছাঁকিয়া।

বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করা্যাছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
খাইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে ॥
মো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুলশীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরিতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগ আধের আধ ॥

যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেহ যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি পিরিতি
করয়ে সুজন সনে॥ —তরু. ৮০১

৯. শুন শুন সই কহিলুঁ তোরে।
পিরিতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরিতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরিতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলজ পরাণে না বান্ধে থীর॥
দোসর ধাতা পিরিতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৪২৩

টীকা: পিরিতি পাবক কে জানে এত—প্রেম যে আগুনের মতন পুড়াইবে তাহা কি জানিতাম! পিরিতি দুরন্ত কে বলে ভাল—লোকে বলে পিরিতি ভাল, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা দুরন্ত, কোন বিধিনিষেধ মানে না। দোসর ধাতা পিরিতি হইল—প্রেম যেন দ্বিতীয় বিধাতার ন্যায় আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সিধি—সিদ্ধি।

১০. পিরিতি পিরিতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
পিরিতি গঢ়ল কে॥
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরিত-কণ্টক হিয়ার ফুটিল
পরাণ-পুতলী যথা॥
পিরিতি পিরিতি পিরিতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নাহি নিভাইল
হিয়ায় রহিল শেল॥

চণ্ডীদাস বাণী   শুন বিনোদিনী
পিরিতি না কহে কথা।
পিরিতি লাগিয়া   পরাণ ছাড়িলে
পিরিতি মিলয়ে তথা॥   —তরু. ৮৭৫

টীকা: কি রীতি মূরতি—তাহার রীতিনীতি কেমন, আকারই বা কি কিরূপ।

দ্বিতীয় স্তবক

বর্ষাভিসার

১১. আএল পাউস নিবিড় অন্ধকার।
সঘন নীর বরিস বরিসএ জলধার॥
ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ।
পথ চলইত পথিকহু মন ভঙ্গ॥
কওনে পরি আওত বালভু মোর।
আগু ন চলই অভিসারিনি পার॥
গুরুগৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি।
তথিহু বধূজন সঙ্কা আথি॥
নদিআ জোরা ভউ অথাহ।
ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ॥ —বিদ্যাপতি, নেপালপুথি ১৮৭

টীকা: বর্ষা আসিল, ঘন অন্ধকার, মেঘ সঘনে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। ঘন ঘন বিজলী চমকাইতেছে, দেখিতেছি রঙ্গ (অভিসার ও মিলনের) বাধা পাইতেছে। পথ চলিতে পথিকের মন ভাঙ্গিয়া যায়। কিরূপে আমার প্রিয় আসিবে? অভিসারিকাও আগাইয়া যাইতে পারিতেছে না। গুরুজনের ঘর হইতে শুইবার ঘরে যাইতে বধূজনের ভয় হয়। নদী জোর ও অথৈ হইল। ভয়ঙ্কর সাপ পথে চলিতেছে।

১২ রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতিখনে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীম ভুজঙ্গম সরনা। সর্প
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
বিহি পায়ে করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরি করু অভিসার॥

গগনে সঘন মহি পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন-আন্ধিয়ার।
চলইতে খলই লখই নাহি পার॥
সব জনি পালটি ভুললি।
আওত মানবি ভাল ত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতি পরাভব সহই॥ —তরু. ৭৭৭, কী. ৩৩১

টীকা: রজনী ছোট, রমণী অতিশয় ভীরু। কতক্ষণে সেই গজগামিনী আসিবে? একে তো পথে কত ভয়ঙ্কর সাপ রহিয়াছে, আরও কত সঙ্কট রহিয়াছে, আবার তাহার চরণ-দুখানি কোমল। হে বিধাতা, তোমার পায়ে মিনতি জানাইতেছি নির্বিঘ্নে যেন সুন্দরী অভিসার করিতে পারে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পৃথিবী কর্দমাক্ত, বিঘ্ন চারিদিকে যেন ছড়াইয়া আছে। দশদিক ঘন অন্ধকার, চলিতে গেলে পা পিছলাইয়া যায়, পথ দেখা যায় না। সে কি এসব ভুলিয়া গেল? এত সত্ত্বেও যদি সে আসে তবে বলিতে হইবে সে মিলনের উৎকণ্ঠায় চঞ্চলা হইয়াছে বা মিলনের জন্য লোভার্তা হইয়াছে। বিদ্যাপতি কবি বলেন যে, কুলবতী প্রেমের প্রভাব সহ্য করিতেছেন।

১৩. করিবর রাজ- হংস জিনি গামিনি
চলিলহুঁ সঙ্কেত গেহা।
অমলা তড়িত- দণ্ড হেম-মঞ্জরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙু-লতা ধনু ভ্রমর ভুজজিনি
জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনি চকোর সফরি বর মধুকর
মৃগি খঞ্জন জিনি আঁখি॥
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি
গৃধিনী শ্রবণ বিশেখি॥
কনক-মুকুর শশি , কমল জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্বু অধর পভারে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগ বিজ
জিনি কম্বুকণ্ঠ আকারে॥

বেল তালযুগ হেম-কলস গিরি
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাশ বল্লরি জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোম লতাবলি শৈবল কজ্জল
ত্রিবলি তরঙ্গিণি রঙ্গা।
নাভি সরোবর সরোরুহ-দল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী করিবর-কর জিনি
স্থল-পঙ্কজ পদ-পাণি।
নখ দাড়িম-বিজ ইন্দু-রতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বাণী ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধা রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৩৩

টীকা : এই পদটিতে অভিসারিকা রাধিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত যতগুলি সম্ভব উপমা দেওয়া হইয়াছে। রাধার গতি শ্রেষ্ঠ হস্তী ও রাজহংসীকে হারাইয়া দেয়। তাঁহার দেহ বিদ্যুতের দণ্ড (যদি সেরূপ কিছু সম্ভব হয়) ও সোনার মঞ্জরীকে, কেশকলাপ মেঘ, অন্ধকার, চামর, ভ্রমর ও শৈবালকে, এবং ভ্রূ কন্দর্পের ধনু, ভ্রমর ও সর্পিণীকে হারাইয়া দেয়। কপাল অর্ধচন্দ্রকে জয় করে। চোখ নলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জনকে জয় করে। নাসা তিলফুলকে ও গরুড়ের চঞ্চুকে হারাইয়া দেয়। কর্ণ শকুনির কানের চেয়েও ভাল। মুখখানি তাঁহার স্বর্ণদর্পণ, চাঁদ ও কমলকে জয় করে। অধর বিম্বফল ও প্রবালকে, দন্ত মুক্তা এবং দাড়িম্ববীজকে, কণ্ঠ কম্বুকে হারাইয়া দেয়। স্তন বেল, তাল, সোনার কলস, পাহাড় ও বাটিকে জয় করে। বাহু মৃণাল, পাশ ও লতাকে এবং কটিদেশ ডমরু ও সিংহকে হারাইয়া দেয়। লোমলতাগুচ্ছ শৈবাল ও কজ্জলকে, ত্রিবলী নদীর শোভাকে, নাভি সরোবরস্থ পদ্মকে এবং নিতম্ব হস্তিকুম্ভকে জয় করে। হস্ত ও পদ স্থলকমলকে, নখর করকবীজ, চন্দ্র ও রত্নকে, বচন কোকিল ও অমৃতকে হারাইয়া দেয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাধার সৌন্দর্য অপার। রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ দশ অবতারের পরবর্তী একাদশ অবতার।

গীতগোবিন্দের (১০।১৫) শ্লোকে আছে যে রাধার অধর বন্ধুক ফুলের মত রক্তবর্ণ, কপোল মহুয়া ফুলের মতন স্নিগ্ধ-পাণ্ডুর, চোখ নীলপদ্মের শোভাকে তুচ্ছ করে, নাসা তিলফুলের মতন এবং দাঁত কুন্দফুলের মতন আভাযুক্ত।

কিন্তু জীব ও উদ্ভিদ্ জগতের এতগুলি বস্তুর সঙ্গে একই পদে নায়িকার দেহ-সৌষ্ঠবের বর্ণনা মধ্যযুগের কাব্যেও বিরল। ইহার সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর নামে আরোপিত অভিসারিকা রাধার রূপবর্ণনা পরের পদে দ্রষ্টব্য।

১৪. সাজল ধনী চন্দ্রবদনী
শ্যামদরদশন আসে।
সঙ্গিনীগন রঙ্গিনী সব
ঘেরলি চারি পাশে॥
তরুণারুণ চরণ যুগল
মঞ্জীর তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলি পুঞ্জে পুঞ্জে
গুঞ্জরে মধু লোভে॥
কুম্ভিকুম্ভ জিনি নিতম্ব
কেশরী খীণি মাঝে।
পরি নীলাম্বর পট্টাম্বর
কিঙ্কিণী তঁহি সাজে॥
বাহুযুগল থীর বিজুরি
করিশাবক শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ মণি কঙ্কণ
নখরে শশী খণ্ডে॥
হেমাচল কুচমণ্ডল
কাঁচলি তঁহি শোভে।
চন্দ্রকান্ত ধ্বান্তদমন
কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জম্বুনদ হেমযুক্ত
মুকুতাফল পাতি।
ফণিমণিযুত দাম সহিত
দামিনী সম ভাঁতি॥
বিম্বফল নিন্দি অধর
দাড়িম বীজ দশনা।
বেশর তঁহি নলকে ঝলকে
মন্দ মন্দ হসনা॥

নাসা তিল- ফুল চুল
কবরী করবী ছান্দে।
মদনমোহন- মোহিনী ধনী
সাজল তঁহি রাধে॥
নব যৌবনী চন্দ্রবদনী
বৃন্দাবন মাঝে।
মাধবেন্দ্রপুরী রচিত গীত
মিলল নাগর রাজে॥ —পদামৃতমাধুরী পৃ ১।৫৩৬

টীকা: ভৃঙ্গাবলি পুঞ্জে পুঞ্জে ইত্যাদি—শ্রীরাধার পদযুগল তরুণ অরুণের মতন বলিয়া ভ্রমরগণ ভাবিতেছে বুঝি পদ্ম ফুটিয়াছে, তাই তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া মধুলোভে গুঞ্জরন করিতেছে। কুম্ভি কুম্ভ ইত্যাদি—কুম্ভী শব্দের অর্থ হস্তী। গজকুম্ভকে পরাজিত করে এমন নিতম্ব। পট্টাম্বর—রেশমী কাপড়। নখরে শশী খণ্ডে—নখের শোভা দেখিয়া চন্দ্র হার মানে। চন্দ্রকান্ত ধ্বান্তদমন ইত্যাদি—তাঁহার কানে ও গলায় চন্দ্রকান্ত মণি শোভা পাইতেছে; তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার বিদূরিত হয়।

মন্তব্য: পদটির শব্দঝঙ্কার ও ছন্দলালিত্য বুঝাইয়া দেয় যে ইহা কোন প্রতিভাবান্ কবির রচনা। মাধবেন্দ্রপুরী সংস্কৃতে লিখিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে তাঁহার ৫টি শ্লোক (৭৯, ৯৬, ১০৪, ২৮৬, ৩৩০) উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার শ্লোক শ্রীচৈতন্য শ্রদ্ধার সহিত আবৃত্তি করিতেন। একটি শ্লোক—

অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্!

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রস-কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক করিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন॥ —চৈ. চ. ২।৪

মাধবেন্দ্রপুরী গোপালের সেবাভার দুই গৌড়িয়াকে দিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে তিনি স্বয়ং বাঙালী ছিলেন। তিনি কবি ও বাঙালী হইলে এই পদটি তাঁহার পক্ষে লেখা অসম্ভব নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলনগুলিতে

এই পদটি নাই বটে, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ ইহা কীর্তন করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার ছাত্র বনমালী দাস বাবাজী উহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পদরত্নমালা পুথিতে সঙ্কলন করেন। ঐপুথি নবদ্বীপের প্রাচীন কীর্তনীয়া শ্রীনিতাইপদ দাস বাবাজীর নিকট আছে।

১৫. নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচকুচ মানএ ভার॥
কর সয়ঁ কঙ্কন মুদরি।
পথহি তেজল সগরি॥
মনিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥ —তরু. ৯৭৬

টীকা : কর সয়ঁ কঙ্কন মুদরি ইত্যাদি—হাত হইতে কঙ্কণ, অঙ্গুরি প্রভৃতি সবই খুলিয়া ফেলিল (যাহাতে হালকা হইয়া তাড়াতাড়ি যাইতে পারে)। মনমথ হিয়া উজিয়ার—চারিদিকে অন্ধকার হইলে কি হইবে, মন্মথের প্রভায় তাহার হৃদয় উজ্জ্বল। পেমক আয়ুধে কাট—সকল বিঘ্নবিপদকে সে প্রেমের অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিল।

১৬. রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিশ পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার॥
সজনী, বচন ছড়ইত মোহি লাজ।
হোএত সে হোও বরু সব হম অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ॥

অপন অহিত লেখ কহইত পরতেখ
হৃদয় ন পারিঅ ওর।
চাঁদ হরিন বহ রাহু কবল সহ
প্রেম পরাভব থোর॥
চরণ বেঢ়িল ফনি হিত মানলি ধনি
নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সরুপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দুর ওর॥
ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নঅ ভূমি
দিগ মগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি সিব সিব ভাবে জাইহ জিব
জাবে ন উপজু সিনেহ॥
ভণই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্ব।
রাজা সিবসিংঘ রূপনারায়ন
সকল কলা অবলম্ব॥ —নেপালপুথি ২৬০,
রাগতরঙ্গিণী পৃ ১১৪

টীকা: রজনী যেন কাজল বমন করিতেছে; ভয়ঙ্কর সাপ, দুর্বার বজ্র পড়িতেছে। গর্জনে মন ত্রস্ত হইল, মেঘ কুপিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছে; অভিসারে সংশয় পড়িল। সখি! কথা না রাখিতে পারিলে বড় লজ্জা। যাহা হয় হউক, সব আমি মানিয়া লইব, মনকে আজ সাহস দিলাম। নিজের অহিত হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি, কিন্তু মন যে মানে না। চাঁদ হরিণ বহন করে, রাহু কর্তৃক কবলিত হয়, কিন্তু প্রেমের পরাভাব একটুও সহ্য করে না; সাপ চরণ বেষ্টন করিল, ধনী তাহা মঙ্গল বলিয়া মানিল, কেন না নুপুরের আর শব্দ হয় না। সুবদনি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমকে স্বরূপ বল, প্রেমের সীমা কত দূর? ঘুরিতে ঘুরিতে একই স্থানে থাকি অর্থাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথা মনে হয়, সন্দেহ জাগে, মন চঞ্চল হয়। হরি হরি, শিব শিব, প্রেম ঘটিবার পূর্বেই যেন জীবন যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সুচেতনি, শোন, গমন করিতে দেরি করিও না; রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলার ধারক।

১৭. নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
গগন গরজ ঘন মেঘহ।
দুতর জঞ্জ্ন নরি সে আইলি বাহু ভরি
এভবাএ তোহর সিনেহ॥

হেরি হল হসি সমূহ উগয় সসি
বরিসও অমিঅক ধরি ॥
কত নহি দুরজন কত জামিক জন
পরিপন্থিঅ অনুরাগে।
কিছু ন কাহুক ডর সুনল জুবতি বর
এহি পর কিও অভাগে ॥ —নেপালপুথি ২০৫

শব্দার্থ : নিসিঅর—নিশাচর, রাক্ষস। জঞ্জুন নরি—যমুনা নদী। বাহু তরি—বাহু দিয়া সাঁতরাইয়া। জামিক জন—যাহারা রাত্রিতে প্রতি যামে জাগিয়া পাহারা দেয়।

টীকা : রাত্রিতে নিশাচরেরা ঘুরিতেছে, ভীষণ সাপ, গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে। দুস্তর যমুনা নদী, তাহা বাহু দিয়া সাঁতরাইয়া পার হইয়া আসিল, এতই তোমার প্রতি প্রেম। এইবার তাহার পানে চাহিয়া হাস, সম্মুখে শশী উদিত হউক, অমৃতের ধারা বর্ষণ করুক। কত দুর্জন, কত প্রহরী, কত বা প্রেমের পরিপন্থী লোক! যুবতিশ্রেষ্ঠ কাহাকেও ভয় করিল না। ইহার পরও কি তাহার অকুশল (অভাগ্য) হইতে পারে?

১৮. মাধব করিঅ সুমুখি সমাধানে।
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনী করএ কে আনে ॥
বরিস পয়োধর ধরনি করি ভর
রয়নি মহা ভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনি তুঅ গুন মনে গুনি
তসু সাহস নাহি সীমা ॥
দেখি ভবনভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফণিমণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে ॥
নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
আঁগরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মনে মাতলি
কিছু না গুনল বরনারী ॥
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।

কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখন কী ন করাবে ॥ —গ্রিয়ার্সন

টীকা : মাধব ! সুমুখীর মনস্কামনা পূর্ণ করিও। তোমারে অভিসারে সুন্দরী যত কষ্ট করিল তাহা আর কোন্ কামিনী করিতে পারে ? মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, ধরণী জলে পূর্ণ হইয়াছে, রজনী ভয়ঙ্কর ; তথাপি ধনী তোমার গুণ মনে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার সাহসের সীমা নাই। যে ঘরের দেওয়ালে চিত্রিত সাপ দেখিলেও ভয় পায়, সেই সুমুখী সাপের মাথার মণি হাত দিয়া ঢাকিয়া (পাছে সেই মণির আলোতে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় !) হাসিমুখে তোমার কাছে আসিল। সে নিজের পতিকে ছাড়িয়া বিষম নদী সাঁতরাইয়া এবং শ্রেষ্ঠ কুলের কলঙ্ক অঙ্গীকার করিয়া তোমার অনুরাগে মত্ত হইয়া কিছুই গণনা করিল না, এই রসের রসিক কুতূহলী সুকবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন, কাম ও প্রেম দুইই একমত হইলে কখন কি না করাইতে পারে ?

তৃতীয় স্তবক

রাসলীলা

১৯. হেনকালে হৈল কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর।
সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ অতি মনোহর ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি বদন কমল।
খঞ্জন জিনিয়া শোভে নয়ান যুগল ॥
হীরা মণি মাণিক্য শোভে কর্ণের কুণ্ডল।
মউরের পুচ্ছ শোভে কুটিল কুন্তল ॥
নানা বর্ণের পুষ্প মালা হৃদয় উপরে।
সুবর্ণ অঙ্গুরি শোভে বলয়া দুই করে ॥
পায়েতে নূপুর সাজে শ্রীবৎসাদিপতি।
কটিতে কিঙ্কনী বাজে চলে মন্দগতি ॥
নর্তকের বেশ ধরে মুকুট শোভে মাথে।
বালকের সঙ্গে খেলে দেব জগন্নাথে ॥
পীতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালি।
নূতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজুরি ॥
নীলমণি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।
তার মাঝে শোভা করে বিন্দুবিন্দু ঘাম ॥

চিত্রগতি চলে যেন নাটুয়া খঞ্জন।
দেখিয়া যুবতিগণ স্থির নহে মন ॥
কামেতে পীড়িত গোপী চিন্তে কৃষ্ণের চরণ।
কেমত প্রকারে পাই নন্দের নন্দন ॥ —শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৃ ১৩১

২০. নানা গুণে সম্পূর্ণ মনোহর বৃন্দাবন।
গোপী লইয়া ক্রীড়া করিবার হৈল মন ॥
শরত পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বয়ে ॥
কোকিলীর কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশদিক বসন্ত অবতার ॥
নব কিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে।
অধিক পীড়য়ে কাম চন্দ্রের কিরণে ॥
কাম অবতার নারী বংশীনাদ কৈল।
শুনিয়া গোয়ালা নারী মূর্ছিত হইল ॥
জানিল গোবিন্দ বেণু বায়ে বৃন্দাবনে।
চলি গেলা গোপনারী আপনার মনে ॥ —শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৃ ১৪৪

২১. যত আশা করি আইলুঁ তোমার ঠাঞি।
না পূরিল আশা মোর বঞ্চিল গোসাঞি ॥
কৃপানিধি হইয়া কৃপা না করিলে তুমি।
ঘৃণা করি পরিহর কি বলিব আমি ॥
শিশুকাল হইতে সেবি তোমার চরণ।
তবু না কারলে দয়া শ্রীমধুসূদন ॥
একবার যেইজন তোমাকে সোঙরে।
তারে না ছাড়হ তুমি বলয়ে সংসারে ॥
কায়মনবাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল।
তথাপি তোমার চিত্তে দয়া না জন্মিল ॥
তোমা না দেখিয়া প্রাণ না পারি ধরিতে।
অঙ্গের ভূষণ করি ইছিয়াছি চিতে ॥
অনুক্ষণ তোমা বিনে আন নাহি মনে।
জাগিতে ঘুমাতে তোমা দেখিয়ে স্বপনে ॥ —শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৃ ১৪৯

২২. এথা গোপিগণ মধ্যে নাঞি গোবিন্দাই।
কৃষ্ণ নাহি দেখি গোপী চাহিয়া বেড়াই ॥

উনমতি পাগলি গোপী আন নাহি মনে।
কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে সব বৃন্দাবনে॥
গাছে গাছে চাহে গোপী চাহে তরুতলে।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যায় যমুনার কূলে॥
কথোদূরে তুলসীয়ে দেখি সন্নিধানে।
বেড়িয়া বসিলা তাঁকে সব গোপিগণে॥
কোন দিগে গেলা কৃষ্ণ কহ ঠাকুরাণি।
গোবিন্দের প্রিয় তুমি ত্রিজগতে জানি॥
না ভাণ্ডিহ সত্য বল পড়হুঁ চরণে।
সপত্নীক ভাব কিছু না করিহ মনে॥ —শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৃ ১৫৬

২৩. বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে॥
বংসগণ সঙ্গে আইসে বেণু বাজাইয়া।
গোকুলের রমণীর চিত্ত সে হরিয়া॥
যমুনার কূলে যবে বংশীতে দেয় সান।
ফিরিয়া যমুনা নদী বহয়ে উজান॥
দরবে পাষাণ তরু বংশীর নাদ শুনি।
যাহাতে শুনিলে তপ ছাড়ে সব মুনি॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি মউর পক্ষ নাচিতে লাগিল॥
শুকাল যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীর নাদে ফুল ফলে ধরে তরুগণে॥
যত পক্ষগণ থাকে এই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বংশীর নাদ শুনে এক মনে॥
হেন বংশীর নাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পুরে।
কোথা গেলে পাব সখি নন্দের কুমারে॥ —শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৃ ১৬৩

চতুর্থ স্তবক

বিরহ

২৪. চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদি গিরি আঁতর ভেলা॥

পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনে মোহে কে কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জিবনে॥
পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥—পদা. সমুদ্র ৩২৫, তরু. ১৬৭০

টীকা: চির চন্দন উরে ইত্যাদি—দয়িতের সহিত পরিপূর্ণ মিলনের বিঘ্ন হইবে বলিয়া বুকে বসন, চন্দন ও হার দেই নাই। আঁতর—অন্তর, ব্যবধানে রহিল। মোহে কে কি না কহলা—আমাকে কে কি না বলিল। ভরমে—ভ্রমক্রমে।

এই পদের ভাষার সঙ্গে নেপালপুথির ও মিথিলার রামভদ্রপুরের পুথির এবং গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভাষার একটুও মিল দেখা যায় না। বিদ্যাপতির ভাষাকে ঢালিয়া সাজিয়া বাঙালীরা আপন করিয়া লইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ইহাকে আবার মৈথিলী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন—

উর হার ন চীর চন্দন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হম কাহু ন গণলা।
সে পিয়া বিনা মোহে কে কি ন কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিসরল জঞো কি অরু জীবনে॥ ইত্যাদি

২৫. সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিল এক হয়ে যুগ চারি।
বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি করল মুরারি॥
সজনি কীয়ে করব পরকার।
কি মোর করম-ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন-বিকার॥
নারীর দীঘ নিশাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার কাছে বৈসে।

পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহোঁ তছু পাশে ॥
আনি দেই পিউ রাখহ আমার জিউ
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে
তুরিতহিঁ মীলব কান ॥ —পদা. সমুদ্র ৩১৮, তরু. ১৬৪২

টীকা: এই পদের ভাষা এতই বেশি বাংলা যে ইহা 'বিদ্যাপতি-পদাবলী'র কোন সংস্করণে স্থান পায় নাই। মিত্র-মজুমদার সংস্করণে এটি বাঙালী বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

২৬. লোচন-লোর তটিনি নিরমাণ।
ততহিঁ কমল-মুখি করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জিবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥
কুন্তল কবরি উলটি উড়ে পড়ই।
জনু কনয়া-গিরি চামর ঢরই ॥
তুয়া গুণ গণাইতে নিন্দ না হোই।
অবনত-আননে ধনি কত রোই ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝহুঁ তুয় হিয় দারুণ পাষাণ ॥—পদা. সমুদ্র ৩০৫, তরু. ১৬৮৩

টীকা: অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের আতিশয্য এই পদে দেখা যায়। শ্রীরাধার চোখের জলে যেন একটি নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, আর তাহাতেই সেই কমলমুখী যেন স্নান করিতেছে। 'কমলমুখী' শব্দের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা এই যে কমল যেমন জলের উপরে ভাসে, শ্রীরাধার বদনকমল তেমনি যেন নয়নজলে ভাসিতেছে। কুন্তল কবরি ইত্যাদি—কবরীবন্ধন খুলিয়া গিয়াছে, তাহা বুকের উপর লুটাইতেছে, দেখিয়া মনে হয় যেন স্তনরূপ স্বর্ণগিরি উপরি কৃষ্ণচমরী পড়িয়া আছে।

২৭. হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতি-মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥ —পদা. স. ২২৯, তরু. ১৬৪১

২৮. শুন শুন ওগো মরম সখি।
এ ঘর করণ বিষের সমান
অতি বিপরীত দেখি॥
… … …
ক্ষেণেক সোয়াস্ত নাহি মন চিত
কি হল্য শ্যামের নেহা।
ভাবিতে গুণিতে আন নাহি চিতে
কবে হারাইব দেহা॥
শয়ন ভোজনে জ্বলিছি আগুনে
মুদিয়া নয়ন দুই।
সে রূপমাধুরি ভাবি নিরবধি
কহিল তোমারে সই॥
কোথা না যাইব শ্যামের লাগিয়া
তাপেতে তাপিত হয়্যা।
কে আছে এমন করয়ে শীতল
নন্দের নন্দন দিয়া॥
চণ্ডীদাস কহে সেই সে কালিয়া
কত না জানয়ে রঙ্গ।
নিকট মিলন হব দরশন
হইব তাহার সঙ্গ॥ —বরাহনগর পুথি ৬ (ঙ) ৩৮

২৯. (সখি) রাই, চিত নিবারণ কর।
সে শ্যাম বিহনে তনু হল ক্ষীণ
বচন কহিতে নার॥
সোনার বরণ দেখি যে মলিন
শুকায়াছে মুখচান্দ।
সে মুখ-মাধুরি হেন দশা করি
বিথার মলিন কান্দ॥
যে দেখি যে শুনি শুন বিনোদিনি
পরাণ হারাবে পারা।
সোনার বরণ হইল মলিন
পাঁজর দেখি যে সারা॥

কান্থর বিরহ- শরে জরজর
কতক্ষণ জীবে রাই।
যাহার অন্তরে বিরহ পশিল
কতক্ষণে জীয়ে সেই॥
চণ্ডীদাসে কহে শুন রসবতি
একটি বিনতি মোর।
হইবে দরশ করিতে পরশ
তুরিতে করিবে কোর॥

—বরাহনগর পুথি ৬ (ঙ) ৩৯

টীকা: বিথার—বিশৃঙ্খল। জীবে—বাঁচিবে।

৩০. সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
সে যে হৃদয় বিদরে।
না হয় মরম না রহে জীবন
মরম কহিব কারে॥
সই, কি ছিল আমার কপালে।
রোপিল কলপলতা না হ'ল তাহার পাতা
শুকাইয়া গেল সেই ঠামে॥
জনম অবধি করি ক্ষীর নীর ধরি
সিঞ্চিল ও লতামূলে।
ক্ষীরের গরিমা নীরের যে সীমা
হরিয়া লইল আনলে॥
যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হইল বনবাসী।
চণ্ডীদাসে কয় সে কথাটি হয়
পরশে করিবে সুখী॥

—নীলরতন মুখোপাধ্যায় ৩৩২, ক. বি. পুথি ২৯৮

টীকা: সাঁজে নিবাইল বাতি—শ্রীরাধার যৌবন আসিতে না আসিতেই বিরহ ঘটিল। রোপিল কলপলতা—কল্পলতা সমস্ত কামনা পূর্ণ করে, তাই উহা রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা প্রচুর দুগ্ধ ও বারিসিঞ্চন সত্ত্বেও শুকাইয়া গেল।

পদাবলী-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হইতেছে ষোড়শ শতাব্দী। ইহার প্রধান, এমন কি এক-মাত্র উৎস হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। উৎকলের রায় রামানন্দ ও বাংলার যশোরাজ খান্ প্রভুর ভাব প্রকাশের পূর্বে সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে যে শ্লোক ও পদ লিখিয়াছিলেন তাহার ভণিতায় নিজ নিজ নিয়োগকর্তা—প্রতাপরুদ্র ও হুসেন শাহের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ঐরূপ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত কোন বৈষ্ণব কবি সাধারণতঃ এরূপভাবে রাজা-মহারাজের নাম ভণিতায় দেন নাই।

১৫০৯ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখ মাস হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে সংকীর্তন আরম্ভ করেন। গয়া হইতে ফিরিবার পর হইতে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বের মত ছাত্রদিগকে পড়াইবার চেষ্টা করিয়া শেষে দেখিলেন তাঁহাকে দিয়া আর অধ্যাপনার কাজ সম্ভব নহে। তিনি শিষ্যদিগকেও কীর্তন করিতে উপদেশ দিলেন। কেহ কেহ তাঁহার কথামত পড়াশুনা ছাড়িয়া কীর্তনে মাতিলেন। সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া দূর দূর দেশ হইতে বহু ভক্ত, কবি ও গায়ক নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রভুর ভাব দেখিয়া যে সব পদ লিখিলেন তাহাতে বাংলা সাহিত্যে প্রেমের বন্যা আসিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নবদ্বীপে যে সব ভক্ত মিলিত হইয়া পদরচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের মধ্যে নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, গোবিন্দ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, যত্নাথ কবিচন্দ্র, বসু রামানন্দ এবং নিত্যানন্দ ভক্ত বলরাম দাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, সুন্দর দাস বা সুন্দরানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের জীবনী ও পদাবলী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মৎকৃত 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য'-এ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে সব মহাজন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া পদরচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শ্রীরূপ, রঘুনাথদাস গোস্বামী, অনন্ত দাস, দেবকীনন্দন, নয়নানন্দ ও কানুরাম দাস। শ্রীচৈতন্যকে দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও যাঁহারা প্রভুর পরিকরগণের সাক্ষাৎ সংসর্গে আসিয়াছিলেন এমন কয়েকজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষে ও তৃতীয় পাদের প্রথমে পদ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন বৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, লোচন, মাধব আচার্য ও 'কৃষ্ণমঙ্গল'-এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য, এবং শ্রীচৈতন্যের সহচর লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন

হইতে গোস্বামীদের রচিত কাব্য, নাটক, অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিয়া আসিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশে ঐ সব গ্রন্থের প্রচার করেন। তাহার ফলে পদাবলী 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও 'স্তবাবলী'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। শ্রীনিবাসের শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথম দুই দশকেও পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রেষ্ঠ সাধক ও বড় দরের কবি ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। রায় বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধু। শ্রীনিবাসের শিষ্য গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ও বীর হাম্বীরও পদরচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন ঐ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়শেখরের গুরু।

প্রথম স্তবক

সংকীর্তনের অধিবাস

৩১. এক দিন পহুঁ হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণি সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সভাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন।
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধি ফুলমালা
কীর্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।

মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সভে হরি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে ॥ —তরু. ২৭

টীকা : পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দ প্রভুর সহচর ছিলেন। 'গোপালভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ' (চৈ. ভা. ৩।৫)। নিত্যানন্দপ্রভুর মূর্তি পূজায় তিনি ছিলেন অগ্রণী, বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বর দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ —চৈ. ভা. ৩।৬

সংকীর্তন-মহোৎসবের সূচনায় আগের দিন সন্ধ্যাবেলা অধিবাস করার যে রীতি আছে তাহা শ্রীগৌরাঙ্গই প্রবর্তন করেন। এই ঐতিহাসিক পদটি হইতে তাহা জানা যাইতেছে। অদ্বৈত সে সময়ে নবদ্বীপে ছিলেন।

সীতা ঠাকুরাণী—অদ্বৈতপ্রভুর গৃহিণী। যেবা বায়—যে বাজনা বাজায়।

৩২. জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল-মঙ্গলের সাজ ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন দেই মালাচন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া করে তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্তন-মঙ্গল ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বোলে ঘনে-ঘন
কালি হবে কীর্তন মহোৎসব।
আজি খোল-মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব ॥ —তরু. ২৬

টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত কীর্তন-মহোৎসবটি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা যে উহা লইয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অপর এক মহাজনও পদ রচনা

করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বংশীবদন। প্রেমদাস ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী'তে লিখিয়াছেন যে একবার রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দ পুরীতে বংশীবদনের নিম্নলিখিত পদটি গাহিয়াছিলেন এবং কাশী মিশ্র উহা মহারাজা প্রতাপরুদ্রকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে।
দরবয়ে দারু শীলকুল বিগলিত তরু কুল
বিকশিত ব্রততীর সনে॥
দিনকরজালে জালা নাহি হোয়ত
কুল হরিণ অলি আলী।
দৈবত যে বৈঠ নিজতনু বিস্মৃত
শম্ভু স্বয়ম্ভু মুখ-বিস্ময়-শালী॥
যমুনা যজ্ঞ-সুতাদিক ধূলিগণ নিরখ
নিরখি গীত ভেও মুরলী-আলাপে।
লাজ মান গৃহ দেহ ভুলায়ল চপল
করায়ল যুবতি-কলাপে॥
পরমামৃত-সিঞ্চিত ভেল ত্রিভুবন
গোকুলনাথ-বদন-বেণু-গানে।
বংশীবদন ভণই হরি বংশী কতই
কলারস-কৌতুক জানে॥ —চৈ. চন্দ্র. কৌ. পৃ ৩৬০

৩৩. আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণ-ঘট-স্থাপন
আম্র-পল্লব সারি সারি।
দ্বিজে বেদ-ধ্বনি করে নারীগণ জ-জকারে
আর সভে বলে হরি হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সভে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
কীর্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সভার আনন্দ মন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্য-কীর্তন।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ রাম
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন॥ —ভক্ত. ২৫

টীকা: জ-জকারে—উলুধ্বনি দেয়। চৈতন্য-কীর্তন—শ্রীচৈতন্যবিষয়ক কীর্তন।

৩৪. জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচী-নন্দন
মঙ্গল নটন সুঠান রে।
কীর্তন-আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ-গ্যান রে॥
দাং দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মঞ্জীর রসাল রে।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল
মিলল পদতলে তাল রে॥
কো দেই গোরা-অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কো দেই মালতী-মাল রে।
পিরিতি-ফুল-শরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোর রে॥
কোই বোলে গোরা জানকী-বল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে।
নয়নানন্দ মনে আন নাহি জানে
আমারি গদাধরের প্রাণ রে॥ —ক্ষণদা. ৩০।১

টীকা: পদকর্তা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। সুঠান—সুঠাম, সুন্দর ভঙ্গীযুক্ত। শ্রীবাস রামানন্দে—শ্রীবাস ও রামানন্দ বসু। মুকুন্দ বাসু—মুকুন্দ দত্ত ও বাসু ঘোষ। ইঁহারা ভাল কীর্তন করিতে পারিতেন। কোই বোলে গোরা জানকী-বল্লভ—মুরারি গুপ্ত রাম-উপাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি গৌরাঙ্গদেব ও রামচন্দ্রকে অভিন্ন মনে করিতেন।

দ্বিতীয় স্তবক

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমাধুর্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যভাগবতে সংকীর্তনের একমাত্র পিতরৌ বা সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। কীর্তন প্রচারের জন্যই প্রভুর অবতার গ্রহণ—

এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্তন করিয়া সর্বশক্তি পরচারি॥
সঙ্কীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার॥ —চৈ. ভা., ১।২।১৭৪-৭৫

কিন্তু কীর্তন-গানের প্রথমে যে গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গের ভাব আস্বাদনের পদ গান করা হয়, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে নহে। রাধাকৃষ্ণের লীলারস শ্রীগৌরাঙ্গ যেভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া কীর্তন শ্রবণ করিলে চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্য দূরীভূত হয় এবং পরম আনন্দের উদ্ভব হয়। প্রভুর ভাবমাধুর্য ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যের উৎস-স্বরূপ। আবার ঐ সাহিত্যের অলৌকিক রসভাণ্ডারের চাবি-কাঠিও উহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

৩৫. গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনি দেখি পহু যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পুরুব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলা, কোথা ছিলা, গদগদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরি দাসে॥

—ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯২৪, ক্ষণদা. ২৭।৪১, তরু. ২১২২.

ভক্তিরত্নাকরের সংকলয়িতা নরহরি চক্রবর্তী এই পদটির নীচে লিখিয়াছেন—'শ্রীনরহরিসরকারঠক্কুরস্য গীতমিদং'। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং পদকল্পতরুতে সরকার ঠাকুরের কয়েকটি পদের সঙ্গে তাঁহার পদও ধৃত হইয়াছে। উভয়ের রচনাশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। একটু চেষ্টা করিলেই পার্থক্য ধরা যায়। যাহা হউক, এই পদটি যে নরহরি সরকারের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

টীকা: পাকে—বিপাকে, বিপদে পড়িলেন। এই পদে দেখা যায় যে, গৌরাঙ্গ কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া রাধাকে স্মরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গদাধর পণ্ডিতকে রাধা মনে করিয়া প্রভু তাঁহাকেই নিকটে টানিয়া লইলেন। তাঁহার পরিকর গদাধর দুই জন—গদাধর পণ্ডিত, যাঁহার আদিম বাসস্থান চট্টগ্রামে এবং দাস গদাধর, যিনি কলিকাতার নিকটস্থ আড়িয়াদহে (এঁড়েদহ) থাকিতেন।

৩৬. হেম দরপণি গৌরাঙ্গ-লাবণি
ধূলায় ধূসর কাঁতি।
অশন বসন তেজিয়া রোদন
ব্রজবিলাসিনী ভাঁতি॥

হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি
ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব কাহারে কহিব
পরাণ ফাটিয়া উঠে॥
সহচরগণে করিয়া রোদনে
কহয়ে বদন তুলি।
আমার পরাণ করয়ে যেমন
বেদন কাহারে বলি॥
নরহরি দাসে গদগদ ভাষে
কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর।
আন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে
সদা রাধা-প্রেমে ভোর॥ —তরু. ৩১৬

পাঠান্তর: তরু.তে 'আসন বসন' পাঠ আছে; মূলে গৃহীত পাঠ বরাহনগর-পুথির। আসন ও বসন ত্যাগ করা অপেক্ষা অশন (খাদ্য) ও বসন ত্যাগ করিয়া রোদন করেন বলিলে অর্থ ভাল হয়।

টীকা: এই পদে দেখা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতেছেন। হেম দরপণি—১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে কাচের আয়নার প্রচলন হয় নাই—১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের পরে ভারতবর্ষে উহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের রঙ সোনার মতন ছিল, তাই উহার সঙ্গে সোনার আয়নার তুলনা করা হইয়াছে। 'আমার পরাণ, করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি'—এই সামান্য কয়টি শব্দ ব্যবহার করিয়া সরকার ঠাকুর প্রভুর অন্তরের অপরিসীম ব্যথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৩৭. সোনার বরণ গৌরাঙ্গ সুন্দর
পাণ্ডুর ভৈ গেল দেহ।
শীতে ভীত যেন কাঁপয়ে সঘন
সোঙরি পুরব লেহ॥
কিছু না কহই দীঘ নিশ্বাসই
চিত্রের পুত্তলী পারা।
নয়ন যুগল বাহি পড়ে জল
যেন মন্দাকিনী ধারা॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
না জানি কেমন তাপে।

কখন সঙ্গীত, কখন রোদন
কিবা করে পরলাপে ॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
চাহয়ে রঙ্কের পারা।
হরি হরি বোলে ভুজযুগ তোলে
মরম বুঝিবে কারা ॥ —তরু. ১৯০৮

টীকা: লেহ—নেহ, স্নেহ, প্রেম। বিরহভাবের বশে প্রভুর দেহে পাণ্ডুরতা বা বৈবর্ণ্য, কম্প, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু, স্বেদ প্রভৃতি সাত্বিক চিহ্ন দেখা গেল। চিত্তের পুতলী পারা—পটে আঁকা ছবি বা চিত্রে অঙ্কিত পুত্তলিকা যেমন কথা বলিতে পারে না, প্রভুও তেমনি নির্বাক। অথচ তাঁহার বুক কাঁপিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। পরলাপ—প্রলাপ। রঙ্ক—দরিদ্র।

৩৮. গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি ॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥
—ক্ষণদা. ৬।১, ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯২১, তরু. ২১২১

ক্ষণদা.র পাঠ:

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ নিজ অঙ্গ দিয়া।
গান বৃন্দাবন-গুণ আনন্দিত হইয়া ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
মুখচাঁদ কি কহিব কহিতে না জানি ॥
নাচেন গৌরাঙ্গচাঁদ গদাধর রসে।
গদাধর নাচে পহুঁ গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥

শ্রীচৈতন্যের প্রথম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্তের এই পদটি ঐতিহাসিকদের নিকট দুইটি কারণে মূল্যবান্। প্রথমতঃ, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবময় জীবনের অপূর্ব আলেখ্য অতি-সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু রাধাভাবে আকুল হইয়া বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া থাকেন; কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন। দ্বিতীয়তঃ,

এই দুই জনের (গৌরাঙ্গ ও গদাধরের) রসে ত্রিভুবন দরবিত অর্থাৎ দ্রবীভূত হইল বলায় গৌর-গদাধর উপাসনার সুত্রপাতের ইঙ্গিত এখানে দেখা যায়।

ক্ষণদা-র ভণিতা :

ত্রিভুবন দরবিত দম্পতি রসে।
মুরারি বঞ্চিত ভেল নিজ মায়া-দোষে ॥

৩৯. চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে ॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥

—ক্ষণদা. ২৯।১, ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯৫২

টীকা : পহু অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ চারিদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনিয়া আনন্দে হাস্য করিতেছেন। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিতেছেন; আর সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া মুকুন্দ দত্ত, সুবিখ্যাত কবি-ভ্রাতৃত্রয় গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষের সঙ্গে গান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই কীর্তনের আনন্দে ঘরদুয়ার ও স্বজনদিগকে ভুলিয়া গেলেন। প্রভুর এই সব রসিক (রঙ্গিয়া) সঙ্গীরা যেন অমৃতরস পান করিয়া উন্মত্ত (ভোর) হইয়াছেন। কবি রামানন্দ বসু গৌরচন্দ্রের অমিয়া পান করিবার জন্য যেন লুব্ধ চকোরের মতন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

৪০. ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল।
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার ॥
ছন্দ বিছন্দে কত জাগে অঙ্গভঙ্গী।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান।
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরিছটা পড়য়ে দশনে ॥

বাঁধুলি জিনিয়া রাঙা ওঠখানি হাস।
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস॥ —ভক্তিরত্নাকর পৃ ৮৩৭

টীকা: এই পদটিতে 'ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস' থাকায় ইহা যে নিত্যানন্দের অনুগত সঙ্গী বলরামের রচনা, তাহা বুঝা যায়। এই পদ হইতে জানা যায় যে, গৌরাঙ্গ নৃত্য ও গীতে সুপটু ছিলেন, তাই তাঁহার মৃদু স্বরে গীত হইতে কিন্নরেরা যেন গান করিতে শিখিতেন এবং তাঁহার তাণ্ডবনৃত্য গন্ধর্বগণ মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেন। প্রভুকে কমললোচন না বলিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নয়ন দেখিয়া কমল যেন সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার দাঁতগুলি ঝকমক করে—হাসিতে যেন বিদ্যুৎ ঝলকিয়া যায়। আর তাঁহার রক্তিম বর্ণের ওষ্ঠে হাসি যেন লাগিয়াই আছে।

৪১. হোলি খেলত গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর॥
ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥
খেনে খেনে মুরুছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জ মন্দির পহুঁ কয়ল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্ধন যমুনাকো কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী।
যাহা পহুঁ গদাধর তাহা রস খানি॥

—সাধনদীপিকা পৃ ১৪৬, ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯৪৫

টীকা: পদটি কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেনের রচনা। গৌর-গদাধরলীলার ইহা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ। এই পদ হইতে জানা যায় যে, নরহরি সরকার গান করিতেও পারিতেন। তিনি ব্রজলীলার পদ গাহিতেন, আর মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ প্রভৃতি নৃত্য করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার পরিকরগণ যে প্রভুকে কৃষ্ণরূপে ও গদাধর পণ্ডিতকে রাধারূপে দেখিতেন, তাহা প্রথমসংখ্যক নরহরির পদ ও এই পদটি হইতে বুঝা যায়। প্রভুর এখানে কৃষ্ণ-ভাবের আবেশ; তাই তিনি মুরলীর খোঁজ করিতেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সাধারণতঃ তিনি রাধার ভাবেই বিভোর থাকিতেন দেখা যায়।

৪২. গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গা পুলিন রঙ্গে
হরি হরি বলে নিজবৃন্দে ॥
কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহা জিনি
ডগমগি প্রেম-তরঙ্গে।
ও নব-কুসুম-দাম গলে দোলে অনুপাম
হেলন নরহরি-অঙ্গে ॥
প্রিয়তম গদাধর ধরিয়া সে বাম কর
নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে।
ভাবে ভরল তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজন যৈছন সিংহে ॥
ঈষত হাসিয়া ক্ষণে অরুণ-নয়ন-কোণে
রোয়ত কিবা অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন-রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

—ক্ষণদা. ২৮৷১, সাধনদীপিকা পৃ ১৭৩

টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ সঙ্গী বাসু ঘোষের এই পদ হইতে জানা যায় যে, প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে কিভাবে বিহার করিতেন। নরহরি সরকার প্রভুর খুব প্রিয় ছিলেন, তাই তিনি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়াছেন। 'নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে'—এই গোবিন্দ হইতেছেন বাসু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ। তিনি কৃষ্ণের গুণকীর্তন করিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই কৃষ্ণ, এই দৃঢ় বিশ্বাস ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দেই ভক্তদের মনে জন্মিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—'নিজগুণ' গোবিন্দ গান করিতেছেন। প্রভুর ভাবাবেশের চিত্রটি নরহরির তৃতীয় পদটির অনুরূপ।

৪৩. শ্রীদাম সুবল সঙ্গে যে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর-হরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল ॥
রাস রস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমার তরঙ্গ।
বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ ॥

রাধার ভাবেতে ভোরা বরণ হইল গোরা
রাধানাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি পহুঁ যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্ধন ॥
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হয়ল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পায়ল লবলেশে
ধিক্ রহু এ ছার জীবন ॥

—ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯১৯, তরু. ২১২৮

টীকা: বাসু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ এই পদে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-ভাবে আবিষ্ট হইবার কথা বলিতেছেন। 'রাধার ভাবেতে ভোরা' অর্থে এখানে রাধার জন্য উন্মত্ত, তাহা না হইলে 'রাধানাম জপে অনুক্ষণ'-এর সঙ্গত অর্থ করা যায় না। রাধার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যেন রাধার মত গৌরবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। 'বলি পুন হরয়ে চেতন' স্থলে জগবন্ধু ভদ্র (পৃ ২৮১) 'হরয়ল চেতন' পাঠ পাইয়াছেন। উহাকে 'হারায় চেতন' বলিলে সুন্দর পাঠ হয়। লব—কণা। রামানন্দ—এখানে বসু রামানন্দের উল্লেখ; কেননা, রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম দেখা হয়। শ্রীবাস—ইঁহারই গৃহে অধিকাংশ দিন প্রভুর নৃত্য-বিলাসাদি হইত। জগদানন্দ—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥ —চৈ. চ. ১।১০।২১

৪৪০ সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া ॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।
না জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা।
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া ॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরুছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া ॥

—গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৯৩, তরু. ২১২৭

টীকা: শিবানন্দ সেন এখানে প্রভুর কৃষ্ণ-উন্মত্ততার বর্ণনা করিতেছেন। তাই তিনি লিখিতেছেন যে, 'রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরুছিয়া'। প্রেমে উন্মত্ত হইয়া থাকায় প্রভু বুঝিতে পারেন না—কোথা দিয়া দিন বা রাত্রি চলিয়া যাইতেছে।

'গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া'—সম্ভবতঃ এই গোবিন্দ, গোবিন্দ ঘোষ; সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ আচার্যও হইতে পারেন। কিন্তু নীলাচল-লীলার সেবক গোবিন্দ কিছুতেই নহেন; কেননা, ঐ গোবিন্দ প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের অনেক পরে মিলিত হন।

রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোর বর
নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এ সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে বেথা
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যাম তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরস বিলাইতে
অনুরাগে গৌর-তনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥ —তরু. ২২৫৭

টীকা: এই পদটি নরহরি সরকারের, নরহরি চক্রবর্তীর নহে। ইহা যদি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত হইত, তাহা হইলে ইহাতে গৌরাঙ্গ যে কৃষ্ণই, এবং তিনি ব্রজের নিগূঢ় নিকুঞ্জ-রস বিতরণের জন্য রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, এই কথা বলিতে এত সঙ্কোচ দেখা দিত না। কেননা, স্বরূপদামোদর ঐ কথা ঘোষণা করেন এবং কবিকর্ণপুরের ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় উহা সুপ্রচারিত হয়। এই পদটিতে নরহরি সরকার যেরূপ গুহ্যকথারূপে তত্ত্বটির কথা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, স্বরূপদামোদরের পূর্বেই তিনি ইহা লিখিতেছেন।

৪৬. দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥

আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি॥
করিলা পিরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
রস রস বিরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥ —তরু. ৭৯৯

টীকা: নীলাচল-লীলায় আর প্রভুর কৃষ্ণভাবে ভাবিত হওয়ার কথা দেখা যায় না। এখানে তাঁহার গোপীভাব। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার ন্যায় তিনি যেন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রথমে তো তুমি আমার জন্য আকাশের চাঁদ আনিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন তোমার খবর (সন্দেশ) পাওয়াও মুশকিল, অথবা তুমি সন্দেশের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—('এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ'—ঠিক এই ভাষা নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ২৫১ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়)। কয়েকটি চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদের প্রাচীনতর রূপ নরহরি-ভণিতায় পাওয়া যায়।

৪৭. রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
ক্ষণে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ-বিলাসে॥ —তরু. ৮২০

টীকা: এটিও নীলাচল-লীলার ভাববর্ণনা; কেননা, ইহাতে স্বরূপের কথা আছে; এই স্বরূপ হইতেছেন স্বরূপদামোদর, নবদ্বীপ-লীলায় গৃহস্থাশ্রমে যাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। রামানন্দ এখানে রায় রামানন্দ। আলি—সখি। বাঁশীরে দেয় গালি—বংশীর প্রতি আক্ষেপ এই যে, বাঁশীই তাঁহাকে ঘরছাড়া,

কুলছাড়া করিল। বধির সমান মোরে কৈল—আমার কানে শুধু বাঁশীর শব্দই বাজে, আর কিছু প্রবেশ করে না।

৪৮. প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে॥
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল।
ঘরের বাহিরে মুই আইল॥
কহে পুন হইবে মিলন।
তাই মুই আইনু কুঞ্জবন॥
বেশ বানাইনু কত মতে।
আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে॥
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে।
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥
স্বরূপেরে এত কহি গোরা।
অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে।
কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে॥

—পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ, মাধুরী পৃ ২।৪৮৩

টীকা: খণ্ডিতা নায়িকার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্য স্বরূপদামোদরকে বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ শঠ। কৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া কুঞ্জে ডাকিয়া আনিয়া অন্যের সঙ্গে রাত্রি কাটাইল। খণ্ডিতার পদ আস্বাদন করিতে হইলে প্রভুর এই ভাবের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহা না রাখিলে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কথা মনে উঠিয়া চিত্ত মলিন হইবার আশঙ্কা থাকে।

৪৯. গৌরাঙ্গচান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে॥
করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচান্দ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥ —তরু. ৮৩২

টীকা: নরহরি সরকারের এই পদেও চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাসের রাধার ন্যায় আক্ষেপ করিয়া প্রভু বলিতেছেন—'দু কুলে কলঙ্ক হৈল

না যায় পরাণি'। পদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইতেছে—শ্রীচৈতন্যের 'ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে' সঙ্কল্পের ভিতর। কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতায় অধীর হইয়া রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কথা প্রায়ই ভাবিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, তিনি একবার অন্ততঃ সত্য সত্যই ঝাঁপ দিয়াছিলেন। পরে এক ধীবর তাঁহাকে জালে তুলিয়া তীরে আনে।

৫০. গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর॥
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাম করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে॥
অবলা শরীর করে জর জর
মনের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পুরুব বচন
অবনত মুখশশী॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহো না জানে।
পুরুব চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে॥ —তরু. ৮৫৩

টীকা: কহিতে ঐছন পুরুব বচন—শ্রীচৈতন্য দ্বাপর-লীলার রাধার ভাবে আকুল হইয়া মদনের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, কামদেব যে এমন অকাজ করিতেছে, ইহাতে যে অবলার পরাণ যায়, তাহা ভাবিয়া দেখিতেছে না। এই কথা বলিয়া ঠিক মেয়েদের মতনই মুখ নিচু করিয়া প্রভু প্রলাপের মতন উক্তি করিতে লাগিলেন।

৫১. নিত্যানন্দ-বন্দনা

শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধানে
নাচে নিত্যানন্দ রায়।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সবাই দেখিতে ধায়॥
ভকত মণ্ডল গাওত মঙ্গল
বাজে খোল করতাল।

মাঝে উনমত নিতাই নাচত
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥
হেম-স্তম্ভ জিনি বাহু সুবলনি
সিংহ জিনি কটিদেশ।
চন্দ্র বদন কমল নয়ন
মদন-মোহন বেশ ॥
গরজে পুন পুন লম্ফ ঘন ঘন
মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণ লোচনে প্রেম-বরিখনে
অবনী-মণ্ডল সিঞ্চই ॥
ধরণী-মণ্ডলে প্রেমের বাদর
করল অবধূত-চান্দ।
না জানে নর-নারী ভুবন দশ-চারি
রূপ হেরি হেরি কান্দ ॥
শান্তিপুরনাথ গরজে অবিরত
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥
মুকুন্দ কুতূহলী কান্দয়ে ফুলি ফুলি
ধরি গদাধর-কোর।
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম
সঘনে হরি হরি বোল ॥
না জানে দিবা নিশি প্রেম-রসে ভাসি
সকল সহচর-বৃন্দে।
শঙ্কর ঘোষ দাস করত প্রতিআশ
নিতাই-চরণারবিন্দে ॥

—ক্ষণদা. ৩০।২, পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৯

টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে নিত্যানন্দকে জানা ও বুঝা প্রয়োজন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে প্রতিদিনের কীর্তনের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার পর নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকা কীর্তন করিবার উপযোগী পদ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পদটিতে 'ভাইয়ার' অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের 'ভাবে মাতোয়ার' নিত্যানন্দের ভাব সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। নিত্যানন্দকে মল্লবেশধারী রূপে বৃন্দাবন দাস ও জ্ঞানদাসও বর্ণনা করিয়াছেন। অভিরাম ঠাকুর নিত্যানন্দের পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের জন্মস্থান

রাধানগরের সংলগ্ন খানাকুল-কৃষ্ণনগরে (হুগলি জেলা) ইঁহার শ্রীপাট। ষোল জন লোকে তুলিতে পারে, এমন কাষ্ঠখণ্ডকে ইনি যোগবলে অনায়াসে উঠাইয়া বাঁশীর মতন করিয়া হাতে ধরিয়াছিলেন।

প্রেমের বিকার—অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক ইত্যাদি '

তৃতীয় স্তবক

গোষ্ঠলীলা

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলায় মা যশোদার বাৎসল্য ও শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতির সখ্য সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের কোন বাঙালী কবির সখ্য ও বাৎসল্যরসের কোন রচনা পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে যাইবার পথে শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁহার নয়নে নয়নে মিলন হইল; দ্বিপ্রহরে তিনি সখাদিগকে ধোঁকা দিয়া, রাধাকুণ্ডে যাইয়া রাধার সঙ্গে বিলাসাদি করিলেন, এরূপ ভাবের বর্ণনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোন রচনায় দেখা যায় না। কিন্তু গোবিন্দদাসের যুগের গোষ্ঠলীলায় সখ্য ও বাৎসল্য-রসকে গৌণ করিয়া শৃঙ্গারসকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

৫২. আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয় ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ফিরায় পাঁচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥ —তরু. ১১৮৬

টীকা : পদটি খুব সম্ভব ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে আগমনের পরে রচিত হয়। রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, অভিরাম প্রভৃতি নিত্যানন্দের অনুচর সখ্যরসের উপাসক ছিলেন। কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় অভিরামকে শ্রীদাম, সুন্দরানন্দকে সুদাম এবং গৌরীদাস পণ্ডিতকে সুবল-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস বাসু ঘোষের সঙ্গে নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়াছেন—

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥ —চৈ. ভা. ৩।৫, পৃ ৪৫৫

কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া নিমাই তাঁহার পরিকরদের লইয়া গোষ্ঠলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন।

৫৩ গোঠে আমি যাব মা গো, গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
পীত ধড়া দে গো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গ বিভূষণ কৈল রতন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ায় টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি॥ —তরু. ১২১৭

টীকা: মনের আরতি—এখানে উৎকণ্ঠা। ধটী—কটিবসন। টালনি—হেলনা।

৫৪. শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপজাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥

বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণি
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়॥ —তরু. ১২১৮

টীকা: মা যশোদার বাৎসল্য প্রতি শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদকর্তা বলরাম দাস যেন একজন সখা হইয়া মাকে আশ্বাস দিতেছেন যে, বাধা অর্থাৎ খড়ম লইয়া কৃষ্ণের নিকট যোগাইবেন, সুতরাং তাঁহার পায়ে তৃণের অঙ্কুর লাগিবে না।

৫৫. চূড়া বান্ধে মন্ত্র পড়ে নব গুঞ্জা দিঞা।
চন্দনতিলক দিছে রাণী চান্দমুখ চাঞা॥
পীয়ল পাটের ধড়া পরায়ে আটিঞা।
নয়নে কাজর দিছে অনিমিখ হঞা॥
ধড়ায় বান্ধিয়া দিল বিবিধ মিঠাই।
রামের হাতে কানুরে সোপিঞা দিছে মাই॥
রাম পানে চায় রাণী শ্যাম পানে চায়।
কি বল্যা বিদায় দিব মুখে না বায়্যায়॥
বসু রামানন্দ কহে শুন নন্দরাণি।
সভার জীবন-ধন তোমার নীলমণি॥ —সংকীর্তনামৃত ৮৪

টীকা: মন্ত্র পড়ে—শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে দৈব বিপাকে না পড়েন, তাহার জন্য মন্ত্র পড়িতেছেন। চান্দমুখ চাঞা—একবার করিয়া মা চন্দন পরান, তিলক পরান, আর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সৌন্দর্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হন। পীয়ল—পীতবর্ণ। পাটের ধড়া—পাট মানে পট্টবস্ত্র অর্থাৎ রেশমি কাপড়; ধড়া—পরিধেয় বসন, এখানে চাদর অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৫৬. সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া
হাম্বা হাম্বা রব সে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সভে চলিলা একসাথে॥
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনী পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেণু॥

সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেঢ়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥ -তরু. ১১৯০

টীকা: কাচিয়া—বেশ করিয়া। আজকাল যেমন বলি সাজগোজ করিয়া, সেকালে তেমনি বলিত সাজিয়া-কাচিয়া। রাম কানু—বলরাম ও কানাই। কাঁচনী—সজ্জা। পাঁচনী—গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি। তারাগণ বেঢ়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ—ব্রজের গগনে যেন শ্যামরূপ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আর তাঁহার সখাগণ যেন তারকাতুল্য। বাহুড়ায়—ফেরায়।

৫৭. নীল কমলদল শ্রীমুখ মণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
[১]নব ঘন জিনি কালা গলায় গুঞ্জার মালা
আভীর-বালক চারি পাশ॥
মণিময় ঝুরি মাথে [২]অঙ্গদ বলয়া হাথে
রতন-নূপুর রাঙ্গা পায়।
[৩]হাসিতে খেলিতে যায় গোধূলি ধূসর গায়
বর্হা উড়িছে মন্দ বায়॥
[৪]নবীন রাখাল হরি নটবর বেশ ধরি
শিশু সঙ্গে গরুয়া চরায়।
ভূষণ বনের ফুল কি দিব তাহার তুল
মুকুন্দ আনন্দে গুণ গায়॥
—সংকীর্তনামৃত ১৩৫, তরু. ১৩৪৭

এই পদটি ভণিতাহীন অবস্থায় কিছু পাঠান্তরসহ পদকল্পতরুতে (১৩৪৭) ধৃত হইয়াছে।

১. নাচিতে নাচিতে যায় গোধূলি লাগ্যাছে গায়
আহীর-বালক চারি পাশ।
২. কনয়া পাঁচনি হাতে।
৩. আগে আগে ধেনু ধায় পাছে যায় শ্যামরায়।
সভার সমান ঝুঁটা কপালে চন্দন-ফোঁটা
রাখাল কোন জন বিনদিয়া।
শ্রীদামের কান্ধে হাত ওই যায় প্রাণনাথ
রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়া॥

পদটি খুব সম্ভব, শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর মুকুন্দ দত্তের রচনা। মুকুন্দ একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। তরু-র শেষ কলিটি 'রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়া' পরবর্তী কালের সংযোজন মনে হয়। প্রথমে পদটি বিশুদ্ধ সখ্যরসের ছিল; পরে উহাতে শৃঙ্গাররস প্রক্ষেপ করা হইয়াছে।

৫৮. গলিত রজত-গিরি জিনি তনু সুন্দর
জানু লম্বিত বন-মাল।
নীল বসন বনি অপরূপ শোভনি
মরকতে হীর মিশাল॥
ধাওত ধবলি পাছে বলরাম।
চঞ্চল নয়ন চুলয়ে জনু পঙ্কজ
হেরি মুগধ ভেল কাম॥
উভ করে' ধবলি শাঙলি বলি ডাকই
কোমল বৎস লেই কান্ধে।
সঘনে খসয়ে শিখি- পিচ্ছ মনোহর
ছান্দন-ডুরি দেই বান্ধে॥
বয়ান চান্দ অধর জনু বান্ধুলি
তাহে মধুর মৃদু হাস।
বরিখয়ে অমিয়া শ্রবণ ভরি পীবই
সহচর সুন্দর দাস॥ —তরু. ১৩২৭

টীকা: নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ সহচর সুন্দরানন্দ এই পদ ও ইহার পরের পদের রচয়িতা। নিত্যানন্দ বলরাম-স্বরূপ। তাই সখ্যরসের উপাসক সুন্দরানন্দ বলরামের গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৯. নীল বসন রতন ভূষণ
নাটুয়া মোহন বেশ।
বদন-ছান্দে মদন-কান্দে
চামরী চাঁচর কেশ॥
তাহাতে বিনোদ চূড়া।
শিখণ্ড রচিত গুঞ্জায় খচিত
বিবিধ কুসুমে বেড়া॥
গণ্ড মণ্ডলে এক কুণ্ডল
এক মঞ্জরি ফুল।

চান্দ-বদনে শিঙ্গার নিসানে
ধাওয়ে ধবলি কুল ॥
মধু-মঙ্গল বামে সুবল
সমুখে চিকণ কালা ।
তার মাঝে রাম জিনি কোটি কাম
যমুনা দুকূল আলা ॥
সখাগণ সনে ভাণ্ডীরের বনে
যমুনা পুলিনে রৈয়া ।
চরায়ে ধেনু বাজায়ে বেণু
দাস সুন্দরে লৈয়া ॥ —তরু. ১৩২৮

৬০. আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায় ।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায় ॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে ।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাই সঙ্গে ॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম ।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইয়ের কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥
মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয় ।
গেডুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
বলরামদাস দেখি কয় ॥

টীকা : জিতিলে হারয়ে তভু—কানাই জিতিলেও এমন ব্যবহার করেন, যেন তিনি হারিয়া গিয়াছেন । হারিলে জিতয়ে বলরাম—বলরাম হারিয়া গেলেও গায়ের জোরে জয়ীর প্রাপ্য সুবিধা আদায় করিয়া লন । গেডুয়া—গেণ্ডুক বা গোলক, ভাঁটা ।

৬১. নটবর নব কিশোর রায়, রহিয়া রহিয়া যায় গো ।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে, ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ ঘন যে বোলত, মধুর মুরলী বায় গো ॥

নীলকমল বদন চান্দ, ভাওর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
কুটিল অলকা তিলক ভাল, কলিত ললিত তায় গো।
চূড়ে বরিহা গোকুল চন্দ, কিবা পবন বয় মন্দ মন্দ
মধুকর-মন হয়ে বিভোর, নিরখি নিরখি ধায় গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো।
বলরামদাস, করতহি আশ, রাখাল সঙ্গে সদাই বাস।
বেত্র মুরলী, লইয়ে খুরলি, সঙ্গে সঙ্গে যায় গো॥ —অ. ৪৮৭

টীকা: বায়—বাজায়। ভাও—ভরু। কলিত—ধৃত। নয়ানে সঘনে উলটি উলটি ইত্যাদি—শ্রীরাধা পথের কোথাও দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া একটু একটু করিয়া গৌরবর্ণা সুন্দরীকে দেখিতে লাগিলেন; অন্য কিছু আর তাঁহার মনে ধরিতেছিল না।

এই পদটির ভণিতার অংশের পরিবর্তে এই দুই কলি বরাহনগর পাটবাড়ীর এক পুথিতে পাইয়াছি—

অরুণ অধরে ইষত হাস, মধুর মধুর অমিয়া ভাষ
খঞ্জনবর গঞ্জন গতি, বঙ্ক নয়নে চায় গো।
রসের আবেশে অবশ দেহ, মন্থর গতি চলহি সেহ
দাস লোচন দেখয়ে অমনি, হাসিয়া হাসিয়া চায় গো।

চতুর্থ স্তবক

উত্তর-গোষ্ঠ

খেলাধূলা করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম সখাদের সঙ্গে অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই লীলার নাম উত্তর-গোষ্ঠ বা ফেরত-গোষ্ঠ।

৬২. শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাইচাঁদের মুখে শিঙ্গার নিসান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম

দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর বেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন কহে চলহ ভবন[১]॥ —তরু. ২৫৬৪

১. এক কীর্তনীয়ার পুথিতে এই পাঠ পাইয়াছি। 'তরু.র' পাঠ 'গোবর্ধন'; কীর্তনীয়া পাঠ বদলাইয়া পূর্বগোষ্ঠের পদকে উত্তর-গোষ্ঠে চালাইয়াছেন।

টীকা: শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের ভাবের আবেশে ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গাভীর নাম ধরিয়া ডাকিতেই, নিত্যানন্দ প্রভু মুখ দিয়া শিঙ্গা বাজাইবার মতন শব্দ করিলেন। তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দের প্রিয় পরিকর গৌরীদাস পণ্ডিত, অভিরাম প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গোষ্ঠের উপযুক্ত বেশ করিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশ কিভাবে তাঁহার সহচরদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিত তাহা এই পদ হইতে বুঝা যায়। গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট অম্বিকাকালনায়। পরবর্তী কালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হইয়াছিল।

৬৩. যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া।
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে॥
মলিন হইল কানাই মুখখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার॥
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥ —তরু. ১২৯৬

৬৪. ভাল শোভা ময়ূরের পাখে।
চূড়ায় বকুলমালা অলি লাখে লাখে॥
নিবারিতে নারে কেহ নিজকর-শাখে।
শ্রীদাম করে পদসেবা সুবল ধেনু রাখে॥
পত্রে ছত্র করি ধরে ভায়্যা বলরাম।
বসনে বীজন করে প্রিয় বসুদাম॥
কেহো নাচে কেহো গায়ে কানাই বলি ডাকে।
অনিমিখ হঞা কেহো চান্দমুখ দেখে॥

ধবলী শ্যামলী রহে মুখ পানে চাঞা।
মন্দ মন্দ বায়ে কানাইর উড়িছে বরিহা॥
কেহো জল কেহো ফল আনিয়া জোগায়।
বসু রামানন্দ দাস অনুগত চায়॥ —সংকীর্তনামৃত ৩১৫

টীকা: নিজকর-শাখে—সখারা নিজেদের হাতে যে ছোট ছোট ডাল আছে, তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় বকুলমালার গন্ধে আকুল অলিকুলকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। পত্রে ছত্র—পাতাকে ছাতার মতন ধরা হইয়াছে।

৬৫. পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করি॥
বলরামদাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে দ্রুত রোল॥ —তরু. ১২০৭

টীকা: সঘনে বিষম খাই—মা নাম করিতেছেন বলিয়া বার বার আমরা বিষম খাইতেছি। খাইবার সময় শ্বাসরোধ ও হিক্কাকে বিষম খাওয়া বলে।

৬৬. চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু-নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু উর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরয়া একত্র হৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।

যন্তেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥ —তরু. ১২০৮

৬৭. তরুণীলোচন- তাপ-বিমোচন-
হাসসুধাঙ্কুরধারী।
মন্দমরুচ্চল- পিঞ্ছকৃতোজ্জ্বল-
মৌলিরুদারবিহারী ॥ ১ ॥
সুন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি- মুপগচ্ছতি সতি
নবনববিভ্রমশালী ॥ ধ্রু ॥
ধেনুখুরোদ্ধত- রেণুপরিপ্লুত-
ফুল্লসরোরুহ দামা।
অচিরবিকস্বর- লসদিন্দীবর-
মণ্ডলসুন্দর ধামা ॥ ২ ॥
কলমুরলীরুতি- কৃততাবকরতি-
রত্র দৃগস্তুতরঙ্গী।
চারুসনাতন- তনু রনুরঞ্জন-
কারি সুহৃদগণসঙ্গী ॥ —শ্রীরূপকৃত গীতাবলী ২২

অনুবাদ— দিবসের পরিণতি হেরহ এখন সতি!
বনমালী আসিছেন ফিরে।
নূতন নূতন কত অঙ্গভঙ্গী নানামত
কমলচরণ ফেলি ধীরে ॥
মন্দ মন্দ গতি বায় ময়ূর পুচ্ছের তায়
চূড়া দোলে মস্তক উপরে।
তরুণীলোচনতাপ দূর করে অভিশাপ
হেন হাস্য আস্য-সুধাকরে ॥
ধেনুখুর-সংঘর্ষণে উঠিছে ধূলি গগনে
তাহে ব্যাপ্ত কমলের মালা।
শোভা নব ইন্দিবর কান্তিময় কলেবর
মনোহর যেন রসশালা ॥
মধুর মুরলীধ্বনি করিছেন গুণমণি
তব রতি করিতে প্রবল।
শোভাময় সনাতন সঙ্গে সব সখাগণ
করিছেন রস কৌতুহল ॥



৬৮. নন্দত্বলাল বাছা যশোদাত্বলাল।
এত ক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন-প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ ত্ব'খানি॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদনকমলে॥ —তরু. ১২১

টীকা: একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ ত্ব'খানি—ইহা স্নেহবশতঃ, ভক্তিভাবে নহে। গোষ্ঠে গোরু চরাইবার সময় কৃষ্ণের কোমল পায়ে কাঁটা বিঁধিয়াছে কি না, কিংবা কোন চোট লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করার জন্য।

৬৯. কোন্ বনে গিয়াছিলা ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন্ গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে।
একদিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে।
এ দাস বলাই কেনে এ ত্বখ দেখ্যাছে॥ —তরু. ১২১২

টীকা ভুকিল—বিঁধিল।

৭০. রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মনসুখে
নিরখয়ে চাঁদমুখ পানে॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শতশত
মুখ হেরি লহ লহ বোলে।

মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতুহলে॥
জ্বালিয়া রতন-বাতি করে সব আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
দোঁহ রূপের বলিহারি যাই॥ —তরু. ১২১৪

টীকা: লহু লহু—মৃদু মৃদু। হুলাহুলি—উলু উলু ধ্বনি।

৭১. নব নীরদ-নীল সুঠান তনু।
ঝলমল ও মুখচান্দ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুটা।
ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জিনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি॥
ভুজসম্বিত অঙ্গদ মণ্ডনয়া।
নখ চন্দ্রক গর্ব বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু-নখ-রত্নজড়া।
কটি কিঙ্কিণি ঘাঁঘর তাহে মড়া॥
পদ-নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজবালক মাখন লেই করে।
সভে খায়ত দেয়ত শ্যাম-করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদসেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ —তরু. ১১৫৯

টীকা: ঝুটা—চূড়া। বিম্ব—বিম্বফল বা পাকা তেলাকুচা। মণ্ডনয়া—শোভার দ্বারা। গর্ব-বিখণ্ডনয়া—গর্ব দূর করে। রুরু—একপ্রকার হরিণ।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে (১০ম শ্লোক) কবি নৃসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই নৃসিংহ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

পঞ্চম স্তবক

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা বিশেষ করেন নাই। আবার চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিরা রাধার রূপ খুব কমই বর্ণনা করিয়াছেন—কেননা, তাঁহারা শ্রীরাধার সখীদের অনুগা হইয়া যুগলকিশোরকে উপাসনা করিয়াছেন।

৭২. গোরারূপের কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল রে কষিত বাণ সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুম্‌কুম্ জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।
কহে বাসু কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥
—ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯৩৪, তরু. ১১৩৭

টীকা: কষিত বাণ—কষ্টি পাথরে যাচাই করা। কেতকীর দল—কেয়াফুলের পাপড়ি। গোরোচনা—উজ্জ্বল পীতবর্ণের দ্রব্যবিশেষ।

৭৩. চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মন-লোভা।
আকাশে চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতীমালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি-শিখর ঘেরিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঙ্গিয়া॥
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥

হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥ —পদামৃতমাধুরী পৃ ১।৪৪৮

টীকা : ভালে সে…শোভা—শ্রীকৃষ্ণের কপালে ময়ূরের পুচ্ছ দিয়া কে রমণী-জনের মনোহরণকারী চূড়াটি উচ্চে বাঁধিয়া দিয়াছে? দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন শ্যামরূপ নবমেঘে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে। মল্লিকা মালতীমালে…ঘেরিয়া—শুভ্র শ্যামের দেহরূপ নীলগিরির ময়ূরপুচ্ছরূপ চূড়া বেষ্টন করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গার শুভ্র জল মল্লিকা-মালতীর শুভ্র কুসুমদামের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। কালার কপালে চাঁদ ইত্যাদি—শ্যামের কপালে চন্দন ও ফাগের ফোঁটা দেখিয়া মনে হয়, যেন রূপার বেলপাতায় কেহ জবাফুল দিয়া যমুনাকে পূজা করিয়াছে। কালার অঙ্গে কে হিঙ্গুল গুলিয়া দিয়াছে; তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কেহ যমুনাকে রক্তকরবী দিয়া পূজা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম বর্ণের সঙ্গে দুই জায়গাতেই যমুনার কালো জলের তুলনা করা হইয়াছে।

৭৪. অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরুছা পায় ॥
মরোঁ মরোঁ সই, ও রূপ নিছনি লৈয়া।
কি জানি কি খেনে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া ॥
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ান নাচনি
চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে ॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতর পরাণ কান্দে ॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস ॥ —কীর্তনানন্দ পৃ ৪২

টীকা : খেচনি—খচিত, জড়োয়া দেওয়া। ছি ছি কি অবলা—অবলা নারী তো সহজেই চপলপ্রকৃতির, তাহার কথা দূরে থাকুক, রূপ দেখিয়া স্বয়ং মদনও মূর্ছিত হয়। তেরছ বন্ধানে—বঙ্কিম কটাক্ষে।

৭৫. বরণি না হয়ে রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥
বিকচ সরোজ ভাণ মুখ মণ্ডল দিঠি
ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পি পি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর॥
অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল চরণ
নূপুর কটি কিঙ্কিনি কলনা।
অভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢর ঢর
কালিন্দীজলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ কুসুমাবলি তছু পর
শোভে শিখিচান্দকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতি মন ফান্দে। —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৩২

টীকা : বিকচ সরোজ ভাণ—প্রস্ফুটিত কমলের মতন ভাণ বা দীপ্তি যাহার। মুখমণ্ডল দিঠি—বিকশিত কমলের সঙ্গে তুলনীয় শ্যামের মুখমণ্ডল। ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর—তাঁহার চোখ দুইটি যেন নৃত্যপরায়ণ খঞ্জনযুগল। পি পি—পান করিয়া করিয়া। কালিন্দীজলে যৈছে চান্দকি চলনা—কৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ দেহের সঙ্গে কালিন্দীর কালো জলের এবং স্বর্ণ ও মণিবিভূষিত অলঙ্কারের সঙ্গে চন্দ্রের উপমা।

৭৬. কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মুরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥ ধ্রু।
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে॥

দেখিয়া বিদরে বুক ছুটি ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥ —তরু. ১৪৬

টীকা : বৈদগধি ঠাম—বৈদগ্ধী বা রসজ্ঞতার ঠাম, স্থান অর্থাৎ নিলয়স্বরূপ শেষ দুই চরণের মানে এই যে, পাষাণের মতন অত্যন্ত কঠিনহৃদয় ব্যক্তিরও গায়ে যদি শ্রীকৃষ্ণের গায়ের বাতাস লাগে তাহা হইলে সে বিগলিত হয়; আর তাঁহার দেহের স্পর্শ পাইলে সকল অঙ্গ যেন আনন্দে অবাধ্য হইয়া উঠে অর্থাৎ নাচিয়া উঠে।

৭৭. কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদনমন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ-বিথার।
জলদপটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
বমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজমোতিম মাল।
করিবরকর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতি পরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নহ তাই॥
শুনিতে বচন-সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥ —তরু. ২৪৪৬

টীকা : হেরইতে রূপ মদনমন ভোর—রূপ দেখিয়া মদনেরও মন ভুলিয়া যায়। অঙ্গহি অঙ্গ—প্রতি অঙ্গ। তরঙ্গ-বিথার—রূপের তরঙ্গ যেন বিস্তৃত রহিয়াছে। জলদপটল—মেঘসমূহ।

৭৮. নন্দ নন্দন চন্দ্র চন্দন-
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর-
নিন্দিত সিন্ধুর-ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজ কামিনী কন্ত।

কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জ মন্দির সন্ত ॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহু-দণ্ডিত দণ্ড ॥
কঞ্জলোচন কলুষ মোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস ॥

—পদা. সমুদ্র পৃ ১৩২, তরু. ২৪১৯

টীকা : চন্দ চন্দন—চন্দ্র অর্থাৎ কর্পূরযুক্ত চন্দনের গন্ধকে নিন্দা করে, এমন গন্ধ। কম্বু—শঙ্খ। কন্ধর—গ্রীবা। কন্ত—কান্ত, দয়িত। মঞ্জু—সুন্দর। বঞ্জুল—বেতগাছ, কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের মতে অশোক। সন্ত—সজ্জন, এখানে ভাল অর্থে। কঞ্জলোচন—পদ্মের মত চক্ষু। শ্রবণরোচন ভাষ—যাঁহার কথা শুনিতে খুব ভাল লাগে। বাহু-দণ্ডিত দণ্ড—বাহু অর্গলকে দণ্ডিত বা ধিক্কৃত করিয়াছে। নিলয় গোবিন্দদাস—সেই চরণই গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্বরূপ।

৭৯. শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর।
রঙ্গিণী-শোহন ভঙ্গি নটবর ॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুমধনু ॥
থল-কমলদল- অরুণ চরণতল।
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর-কল ॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধর মুরলি ধনি মনমথ-মন্তর ॥
অভিনব নাগর গুণ-মণি-সাগর।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি জাগর ॥ —তরু. ২৪৭০

টীকা : সজল জলদতনু ঘন রসময় জনু—তাঁহার দেহ জলপূর্ণ মেঘের মতন, দেখিয়া মনে হয় যেন ঘন রসে পরিপূর্ণ। রূপে জিতল—সৌন্দর্যের দ্বারা যেন কোটি কোটি মদনকে জয় করিল। মঞ্জীর-কল—নূপুরের শব্দ। মুরলি ধনি মনমথ-মন্তর—মুরলীর শব্দ যেন মন্মথের মন্ত্রস্বরূপ ; এই মন্ত্র শুনিলেই লোকে বশ হয়।

৮০. চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন-নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কূলে কি পেখলুঁ সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলুঁ সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূর পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী
মধুর মধুর বায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাঙা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥ —তরু. ১৪৯

৮১. ব্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণী।
হরিচন্দন-তীলক ভালে বনী॥
শিখি-পুচ্ছকি বন্ধনি বামে টলী।
ফুলদাম নেহারিতে কাম চলী॥
অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চলী।
মুখ নীল-সরোরুহ বেঢ়ি অলী॥
ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেম মণী।
নব বারিদ বিদ্যুত থীর জনী॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটী।
কল-কিঙ্কিণি সংযুত পীত কটী॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চশরং।
করবাদন নর্তন গীতবরং॥

পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দীগ দশে॥
যোগি যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে।
ধায় কামিনি কাননে তেজি কুলে॥
গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ-ভূ-বীরুধ পুষ্প-ফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ —তরু. ১৩২৪

টীকা: ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত—শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ দণ্ডের কাছে স্বর্ণ ও মণি পরাজিত হইয়াছে। নব বারিদ বিদ্যুৎ থীর জনী—তাঁহার সুনীল অঙ্গ ও পীত ধড়া দেখিয়া মনে হয়, যেন নূতন মেঘ ও স্থির বিদ্যুৎ। গিরিরাজ—গোবর্ধন (হিমালয় নহে)। ভূ-বীরুধ—ভূমি ও লতা।

ষষ্ঠ স্তবক

শ্রীরাধার রূপ

৮২. রস-পরিপাটী নট কীর্তন-লম্পট
কত কত সঙ্গী সঙ্গী সব সঙ্গে।
যাহার কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে
বিলসই বিলোল-অপাঙ্গে॥
শুনি বৃন্দাবন-গুণ রসে উনমত মন
দু বাহু তুলিয়া বলে হরি।
ফিরে নাচে নটরায় কত ধারা বসুধায়
দু নয়নে প্রেমের গাগরী॥
পুরুষ প্রকৃতিপর মদন-মনোহর
কেবল লাবণ্য-রসসীমা।
রসের সাগর গৌর বড়ই গভীর ধীর
না রাখিল নাগরী-গরিমা॥
ত্রিভুবন-সুন্দর উন্নত-কন্ধর
সুবলিত বাহু বিশালে
কুঙ্কুম চন্দন মৃগমদ লেপন
কহে বাসু তছু পদ-মূলে॥ —ক্ষণদা. ২১।১

৮৩. চন্দ্র-বদনি ধনি মৃগনয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণি-মণী ॥
মধুরিম-হাসিনি কমল-বিকাশিনি
মোতিম-হারিণি কম্বু-কণ্ঠিনী
থির সৌদামিনি গলিত কাঞ্চন জিনি
তনুরুচি ধারিণি পিক-বচনী ॥
উরজ-লম্বি-বেণি মেরুপর যেন ফণি
অভরণ বহু মণি গজ-গমনী ॥
বিণা-পরিবাদিনি চরণে নূপুর ধ্বনি
রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥
সিংহ জিনি মাঝ খিণি তাহে মণি-কিঙ্কিণি
ঝাঁপি ওঢ়নি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনি জগজন-বন্দিনি
দাস রঘুনাথ পহুঁ মনহারিণী ॥ —তরু. ২৪৬

টীকা: ছয় গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র বাঙালী রঘুনাথ দাস গোস্বামী দান-কেলিচিন্তামণি, মুক্তাচরিত ও স্তবাবলী সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে তিনটি মাত্র পদ রঘুনাথ দাস ভণিতায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৩৮৭ সংখ্যক পদ জয়দেব-বন্দনা, ২৮৬৯ সংখ্যক পদটি ব্রজভাষায় আরতির এবং উপরে উদ্ধৃত শ্রীরাধাবন্দনার পদ। রমণি-মণী—ছন্দের অনুরোধে মণি স্থলে মণী বানান। কমল বিকাশিনি—শ্রীরাধার হাসিতে যেন কমল ফুটিয়া উঠে। মোতিম-হারিণি—যাঁহার গলায় মোতির হার। উরজ-লম্বি-বেণি—তাঁহার বেণী বুকের উপর পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, যেন কুচরূপ মেরুর উপর সাপ রহিয়াছে। ঝাঁপি ওঢ়নি তনু পদ অবনী—ওড়নাতে দেহ ও পা ভূমি পর্যন্ত আবৃত। আজকালও ব্রজমায়ীরা ঐরূপ ওড়না পরেন।

৮৪. কষিল কনয়া কমল কিয়ে।
থীর বিজুরি নিছনি দিয়ে ॥
কিয়ে সে সোণ চম্পক ফুল।
রাই-বরণে জলদ-তূল ॥
তাহি কিরণ ঝলকে ছটা।
বদনে শরদ-বিধুর ঘটা ॥
চাচর চিকুর সিঁথায়ে মণি।
দশন কুন্দ-কলিকা জিনি ॥

অরুণ অধর বচন মধু।
অমিয়া উগারে বিমল বিধু॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরি-বিন্দু।
কনক-কমলে বালক ভৃঙ্গ॥
গলায়ে মুকুতা দোসুতি ঝুরি।
সুরধুনী বেঢ়ি কনক-গিরি॥
শঙ্খ ঝলমলি দু বাহু দোলা।
কিয়ে সরু সরু শশীর কলা॥
কর কোকনদ নখর মণি।
অঙ্গুলি মুদরি মুকুর জিনি॥
খিন মাঝখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
বান্ধল কিঙ্কিণি নিতম্ব-ভরে॥
রাম-রম্ভা উরু চরণ শোভা।
কি হয়ে অরুণ-কিরণ-আভা॥
নখর-মুকুর অঙ্গুলাবলি।
জনু সারি সারি চম্পক-কলি॥
নীল ওঢ়নি ঢাকিল তনু।
সব বিধু রাহু ঝাঁপিল জনু॥
অলপে অলপে তেয়াগে তায়।
যদুনাথ চিতে ঐছন ভায়॥ —তরু. ২৪৭০

টীকা: কষিল—কষ্টিপাথরে যাচিয়া লওয়া সোনা। সোণ—স্বর্ণবর্ণের। রাই-বরণে জলদ-তুল—সোনার মতন রঙের চাঁপা ফুল রাধার গায়ের রঙের তুলনায় যেন মেঘের মতন কালো বলিয়া মনে হয়। চিবুকে শোভয়ে—চিবুকের কস্তুরীর টিপ দেখিয়া মনে হয়, যেন সোনার কমলে ছোট্ট একটা ভৃঙ্গ বসিয়াছে। গলায়ে মুকুতা দোসুতি ঝুরি—মুকুতা দিয়া নির্মিত দুই-ফেরতা লম্বা হারের মতন অলঙ্কার। কুচযুগের উপর উহা শোভা পাইতেছে, যেন সোনার পাহাড় ঘিরিয়া গঙ্গা রহিয়াছে। মুদরি—রত্নাঙ্গুরীয়। অলপে অলপে তেয়াগে তায়—নীল ওড়নায় সর্বাঙ্গ আবৃত, যেন রাহু সকল বিধুকেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ওড়না একটু সরাইয়া রাধা দেখিতেছেন, তাই কবি বলিতেছেন যে, রাহু যেন আস্তে আস্তে চন্দ্রকে গ্রাসমুক্ত করিতেছে।

৮৫. ধনি কনক-কেশর-কাঁতি।
বনি বদন-বিধুক ভাঁতি॥
জিনি নীল-নলিন বাস।
কিয়ে অমিয়া-মধুর ভাষ॥

তাহে চিকুরে কবরি-ভার।
হিয়ে লম্বিত মাণিক হার॥
কুচ কনক-দাড়িম শোহ।
মন-মোহন-মন মোহ॥
ভুজ হেম-মৃণাল জিনি।
তাহে নীল বলয়া মণি॥
নখ শরদ-পূর্ণিমা-চাঁদ।
তনু হেরি অরুণ কান্দ॥
কটি কেশরি জিনি খীণ।
তিন রেখ ত্রিবলি ভীন॥
স্থল-পঙ্কজ পদ-তল।
মণি-মঞ্জির ঝলমল॥
হেরি তাহে অনন্তদাস।
কর সেবন অভিলাষ॥ —তরু. ২৪৬৭

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন-খণ্ডন বদন-বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর-চীত-চোরায়নি হাস॥
আজু নব শ্যাম-বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু-যূথ-শত-সেবিত লাবণি বরণি না যাই॥
কবরি-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রণরণি বোল॥
পদ-পঙ্কজপর মণিময় নূপুর রণঝণ খঞ্জন-ভাষ।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণি দরপণ নীছনি গোবিন্দদাস॥ —তরু. ২৪৬৩

টীকা: শরৎকালের চন্দ্রসমূহের শোভাকে পরাজিত করে, রাধার এমন মুখের সৌন্দর্য। আর তাঁহার অধরে যে স্মিত হাস্য, একটু প্রকাশ পাইয়াই মিলাইয়া যাইতেছে, তাহা শ্যামের চিত্তকে হরণ করিতে পারে। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে (তনু তনু) যেন কামদেবেরা শত শত দল বাঁধিয়া সেবা করিতেছে।

৬৭. জয়তি জয় বৃষ- ভানু-নন্দিনি
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে।
কনয়-শতবান- কান্তি-কলেবর-
কিরণ-জিত-কমলাধিকে॥
ভঙ্গি সহজই বিজুরি কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।

জিনিয়া ফণি বনি বেণি লম্বিত
কবরি মালতি-শোহিতে ॥
খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন-অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি বুন্দ পরকাশি
বিজুরি কত শত ঝলকিতে ॥
রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরি
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেম মাগয়ে
সেই চরণ সমাধিয়া॥ —তরু. ২৪৬৬

টীকা: কনয়-শতবান-কান্তি কলেবর ইত্যাদি—শ্রীরাধার দেহের লাবণ্য শতবার বিশোধিত স্বর্ণের কান্তিকে পরাজিত করিয়াছে। উহা কমলার শোভার চেয়েও অধিক। সমাধিয়া—ধ্যানমগ্ন হইয়া।

সপ্তম স্তবক

পূর্বরাগ

৮৮. অলকা তিলক চান্দ মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটি ॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয় ॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গন ফুলের মালা।
কত রসলীলা জানে কত রসকলা ॥
চন্দন চর্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা ॥
দেবকীনন্দনে বোলে শুন লো আজুলি।
তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী ॥—ভক্তিরত্না. পৃ ২০৭

টীকা: আজুলি—সরলা।

৮৯. ধরণী শয়নে ঝরয়ে নয়নে
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।
চম্পক বরণ তাপে মলিন
হৃদয় দহ অনঙ্গ ॥

(হরি হরি) করুণা কি নহ তুয়া ঠাই।
তোহারি কটাখ- শরে জর জর
অতি ক্ষীণ-তনু রাই॥
এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী
জপিয়া তোহারি নাম।
না জানিয়ে কিয়ে বেয়াধি হইল
শ্বাস বহে অবিরাম॥
সব সখীগণ করয়ে রোদন
কারণ কিছু না জানি।
গৌরীদাস বিধি রচে মহৌষধি
দেবের আবেশ মানি॥ —তরু. ১৬১

৯০ তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাওন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দু নয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥ —তরু. ১৫৫

টীকা: দে—দেয়া, মেঘ। শ্রাবণ মাসের মেঘলা দিন, রিমিঝিমি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; এই পরিবেশ স্বপ্নের কল্পলোক সৃষ্টির উপযোগী। নিন্দে—নিদ্রায়। বলে কিন যাচিয়া বিকাই—বলিল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি সাধিয়া নিজেকে

বেচিয়া দিতেছি। সতি—সত্য। লোর—অশ্রুধারা। পরতীতি—প্রতীতি, বিশ্বাস। চিয়াইল—চেতন করাইল, জাগাইল।

৯১. মন-চোরার বাঁশি বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে॥
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছি গোঙারের হাতে।
কানাই খুঁটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে॥ —পদরসসার হইতে
সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (৪৩৪) ধৃত

টীকা: তরলে জনম তোর—তরল বাঁশ বা তল্লা বাঁশ নামে ভিতরে ফাঁপা একরকম সরু বাঁশ।

কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু নামক আধুনিক সঙ্কলনে পদটি লোচনের ভণিতায় ধৃত হইয়াছে।

৯২. কিবা সে মোহন বেশ ভুলাইল সব দেশ
না রহে সতীর সতীপনা॥
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥
সই হাম কি করিলুঁ কেন বা সে বাঢ়াইলুঁ
কি শেল হানিল জানি বুকে।
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো
কালোরূপ দেখি চোখে চোখে॥
কিবা সে নয়ান বাণ হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে।
উডু উডু আনছান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥
রসের মুরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বোলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥ —তরু. ৭৯৬

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ॥ —লহরী. পৃ ২০৫

টীকা : নেহ—স্নেহ, প্রেম।

৯৪. তুমি কি জান সই কানুর পিরিতি তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন তাহারে সঁপিয়াছি॥
প্রাণ সই, কি আর কুল বিচারে।
প্রাণ বন্ধুয়া বিনে তিলেক না জীউ কি মোর সোদর পরে॥
সে রূপ-সাগরে নয়ান ডুবিল সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল মন আনিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে আছিতে আছিয়ে পুরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে আগুন ভেজাই ঘরে॥

—পদামৃত সমুদ্র পৃ ২৪৯

স্বপ্নে মিলন

৯৫ মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী॥
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥ —তরু. ১৪৪

টীকা এইটি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় পদ ছিল। তিনি নানা স্থানে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে' কবিগুরু লিখিয়াছেন—'কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি "একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল", তখন এই বলার মধ্যে খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়াগরজন
ঝিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে—

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না। এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি।' আবার 'ছন্দ' প্রবন্ধে (সবুজপত্র, চৈত্র, ১৩২৪) বলিয়াছেন—'কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।' তিনি জ্ঞানদাসের পদটিকে ছন্দান্তরিত করিয়া এই রূপ দিয়াছেন—

শ্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্মরি ॥
জলদরব-ঝংকারিত ঝঞ্ঝাতে।
বিজন ঘরে ছিলাম সুখতন্দ্রাতে ॥
অলস মম শিথিল তনুবল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি ॥

ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন—'এই ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে, কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আরেক জিনিস হল।'

৯৬. পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥ ১ ॥
অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥ ২ ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥ ৩ ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥ ৪ ॥
করে কর করিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥ ৫ ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥ ৬ ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥ —তরু. ৫২

টীকা : প্রথম রাধা-মাধবের মিলন হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপও দুর্লভ হইল, কেলি-বিলাস তো দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় করিলে রাধা মুখ নিচু করিলেন। একবার চকিতে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া শঙ্কায় ও দ্বিধায় নখ

দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলেন। চঞ্চল কানাই অঙ্গ স্পর্শ করিতে গেলে শ্রীরাধা একটু সরিয়া গেলেন। বিদগ্ধ (সুরসিক) নাগর তখন রাধার চরণস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। রাধা তাহাতে বাধা দিতে গেলে পরস্পরের কর-স্পর্শ ঘটিল; এই স্পর্শেই সমস্ত বাধা বিদূরিত হইল। উভয়ের মধ্যে প্রেমের উদয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ এমন কৃতার্থ হইলেন, যেন মনে হইল, গরিব লোক ঘট ভরিয়া সোনার মোহর পাইয়াছেন। রাধা তাহা দেখিয়া একটু স্মিত হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ আবৃত করিল (আগোরলি)—মনে হইল, যেন রত্ন দিয়া ফের চুরি করিয়া লইল।

কবি গোবিন্দদাস যেন সাক্ষাৎ এ লীলা দেখিয়া লিখিতেছেন—

আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস।

পদটি ক্ষণদা.য় (২০।১০) জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

তৃতীয় পয়ারের পর ক্ষণদা.য় আছে—

রস-লব-লেশ দেখাওলি গোরী।
পাওল রতন পুন লেওলি চোরী॥

ষষ্ঠ পয়ারে আছে—

হাসি দরশি মুখ ঝাঁপই গোই।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই॥

শেষ পয়ারের স্থানে আছে—

নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রতি-আশ।
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস॥

পদকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয় (পৃ ২৪২), পদামৃতসমুদ্র (পৃ ৭০) সংকীর্তনামৃত (পৃ ৯৯) এবং কীর্তনানন্দে (পৃ ১৭০) পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতাতেই পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনতর ক্ষণদা.র ভণিতা অগ্রাহ্য করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য সঙ্কলনের গোবিন্দদাস ভণিতাই মানা শ্রেয়ঃ।

অষ্টম স্তবক

রূপানুরাগ

৯৭০ গোরাচাঁদ, কিবা তোমার বদন-মণ্ডল।
কনক কমল কিয়ে শরদ পূর্ণিমা শশী
নিশি দিশি করে ঝলমল॥

তোমার বরণখানি জনু হরিতাল জিনি
কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়া।
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবান সোনা
মনমথ-মন-মোহনিয়া॥
খগপতি জিনি নাসা অমিয়া-মধুর ভাষা
তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণ নয়ন বাণ ভুরু-ধনু-সন্ধান
কটাক্ষ হানয়ে নারীমনে॥
আজানু লম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ
অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরম্ভা জিনি উরু
চরণে নূপুর বঙ্ক রাজে॥
জিনি ময়মত্ত হাতী হংসরাজ জিনি গতি
দেখিয়া এহেন রূপরাশি।
কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি॥ —তরু. ১০২৯

টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গের গায়ের রঙের উপমা দিতে যাইয়া কবির মনে সোনার কমল, শারদ পূর্ণিমার চন্দ্র, হরিতাল, স্থির বিদ্যুৎ, নব গোরোচনা, ও দশবার পোড়াইয়া বিশুদ্ধ-করা সোনার কথা মনে হইল। কিন্তু এ সব কিছুই তাঁহার রঙের কাছে লাগে না। তিনি যে মন্মথেরও মনকে মোহিত করেন।

খগপতি—গরুড়। মলয়জ—চন্দন। হেমরম্ভা—সোনার কলাগাছ। ময়মত্ত—মদমত্ত।

৯৮. তরুমূলে মেঘ-বরণিয়া কে ?

ও রূপ দেখিঞা কোন কলাবতী
ধরিব আপন দে॥
যমুনার তটে নীপ নিকটে
নিশি দিশি তার থানা।
গোকুল নগরে কুলের কামিনী
আসিতে যাইতে মানা॥
ক্ষেণে বাজায় বাঁশী ক্ষেণে মধুর হাসি
ক্ষেণে ত্রিভঙ্গিম হয়।
নয়নের কোণে মরম সন্ধানে
চাহিঞা পরাণ লয়॥

নবীন কিশোর নব জলধর
রূপে গুণে নাহি ওর।
নাম নাহি জানি মনে অনুমানি
নরহরি-চিত-চোর ॥ —সংকীর্তনামৃত ২২৬

টীকা : মেঘ-বরণিয়া—মেঘের মত বর্ণ যাহার। থানা—স্থান। আসিতে যাইতে মানা—কৃষ্ণকে দেখিলেই কুলবতীরা মোহিত হইয়া যাইবেন ভয়ে তাঁহাদের গুরুজনেরা ঐ পথে তাঁহাদিগকে যাইতে নিষেধ করেন। নরহরি-চিত-চোর—কবি শ্রীরাধিকার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবিয়া বলিতেছেন, সে নরহরির মনকে চুরি করিয়াছে, ইহাই শুধু জানি।

৯৯. আজু যমুনা গিছিলাম সজনি
শ্যামেরে দেখিঞাছি।
সভে দুটি আঁখি দিঞাছে বিধাতা
রূপ নিরখিব কি ॥ ১ ॥
পহিলে মোর মনে নব জলধর
নামিঞাছে তরুমূলে।
দেখিতে দেখিতে হেদে আচম্বিতে
দু আঁখি ভরিল জলে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রধনু জিনি চূড়ার টালনি
উড়িছে ভ্রমরাজাল।
আঁখি পালটিঞা না পাল্যাম দেখিতে
ঘোঞটা হইল কাল ॥ ৩ ॥
অঙ্গের সৌরভে নাসিকা মাতল
আভরণ কেবা চিনে।
ঝলমল বই অন্য নাহি সই
সদাই পড়িছে মনে ॥ ৪ ॥
নাহি পরিচয় বংশী সব কয়
এ ত বড় পরমাদ।
ও রাঙ্গা চরণের নূপুর শুনিতে
লোচন দাসের সাধ ॥ ৫ ॥ —সংকীর্তনামৃত ২২৫

টীকা : ১. শ্রীকৃষ্ণের রূপ দুইটি মাত্র চোখ দিয়া দেখা যায় না—তাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, সুরপতির নিকট সহস্র লোচন মাগিব, যাহাতে প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতে পারি। ২. শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার প্রথমে মনে হইল,

বুঝি গাছের তলায় মেঘ নামিয়াছে, আর সেই মেঘের বর্ষণও হইল রাধার দুই চোখে।—রূপ দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষু সজল হইল। ৩. সেকালে ঘোমটায় মুখ ঢাকা থাকিত, তাই রাধা ফের ভাল করিয়া কৃষ্ণরূপ দেখিতে পারিলেন না।



মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
জীতে পাশরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তর জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি॥ —তরু. ৭৮৬

টীকা: জীতে পাশরিতে নারি—যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন ভুলিতে পারিব না। লোলাইয়া—চঞ্চল করিয়া, হেলাইয়া। পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাস করে। তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি—এক তিল কালের মধ্যে যেন প্রাণ তিন স্থানে রাখিয়া দিই—অর্থাৎ প্রাণ যেন ছাড়িয়া যায়।

১০১. যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ নাহি ভায় গৃহবাস
তিল আধ পাসরিতে নারি॥
মাথায় করি কুল-ডালা ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহুঁ পুরাব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি
যবে হবে কানুপরিবাদে॥

কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ানের কোণে চায়।
স্বরূপ দঢ়াইলুঁ মন জাতি যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম-পায়॥
মনে ত করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসেতে কয় এমনি যাহার হয়
ত্রিভুবন তাহার নিছনি॥ —তরু. ২৯৩

টীকা: শ্রীকৃষ্ণের যেমন অপূর্ব রূপ, তেমনি সুন্দর বেশ। সেই রূপ ও বেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে বুকের পাশের হাড় যেন ক্ষয় হইয়া গেল। আমার এই পাপচিত্তকে নিবারণ করিতে পারি না। গৃহের বাস আর মনে ভাল লাগে না। যশ, অপযশ, যাহাই হউক, তাহাকে একটু অল্প সময়ের জন্যও ভুলিতে পারি না।

কানুপরিবাদে—কানুর কথা লইয়া কলঙ্ক।

১০২. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরিতির সার॥
গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যামপরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥ —তরু. ৭৪৮

টীকা: ঝুরে—অশ্রু বর্ষিত হয়। লহু লহু—লঘু লঘু, মন্দ মন্দ। লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি—অনুরাগে লজ্জাকে বিসর্জন দিলাম। কেন না, আমার এই ভালবাসাকে গোপন রাখিতে পারি না।

১০৩. কি রূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝুরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর॥
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি শ্যামরূপখানি॥
সহজে মুরতিখানি বড়ই মাধুরি।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুরি॥
আর বা তাহে কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কালার কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদা প্রাণ কাঁদে॥
—পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ, মাধুরী ১।১৭৭

১০৪. কপালে চন্দন চাঁদ নাগরি মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুনি ঠেকিনু ও না ফান্দে॥
সই, কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ কান্দে পুনমিক চান্দ
লাজঘরে ভেজিয়া আগুনি।
নয়ন কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
কালা অঙ্গে পড়িছে বিজুরি।
সে রূপ দঢ়াইলু মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাইঞা দিলুঁ ডালি॥
কি খনে:দেখিলুঁ তারে না জানি কি কৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাসে কয় ও রূপ দেখিয়া
কোন বা পামরী রহে ঘরে॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৭৮

টীকা: চন্দন চাঁদ—চন্দন দিয়া আঁকা চাঁদ।

১০৫. সই রে, বলি—কি আর কুল ধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিল মরমে॥
সই রে, বলি—না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাইতে দেখোঁ বাঁশিয়ার বয়ান॥
সই রে, বলি—তার কি থির সন্ধান।
তাকিয়া মের‍্যাছে বাণ যেখানে পরাণ॥
সই রে, বলি—কি রূপ দেখিলুঁ।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিলুঁ॥
সই রে, বলি—কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥
সই রে, বলি—মনে মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥
—গীতচন্দ্রোদয় ১৫৩, কীর্তনানন্দ ৭৫, পদা. সমুদ্র পৃ ৭৯

পদটি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ 'গীতপদ্যকারক' গোবিন্দ আচার্যের রচনা বলিয়া মনে হয়।

টীকা: তাকিয়া—তাক করিয়া, লক্ষ্য করিয়া।

১০৬. যে দিগে পসারি আঁখি দেখি শ্যামময়।
কুলবতী বরত ধৈরজ নাহি রয়॥
কত না যতনে যদি মূদি দুটি আঁখি।
নবীন ত্রিভঙ্গ রূপ হিয়া মাঝে দেখি॥
কি হৈল অন্তরে সই কি হৈল অন্তরে।
আজি হৈতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে॥
নিরবধি শ্যাম নাম জপিছে রসনা।
এত দিনে অযতনে পূরিল বাসনা॥
প্রাণের অধিক কানু জানিলু নিশ্চয়।
গোবিন্দ দাসেতে কয় দড়াইলে হয়॥ —অপ্র. পদরত্না. পৃ ৩৩

এটিও সম্ভবত গোবিন্দ আচার্যের রচনা।

১০৭. নব জলধর তনু থীর বিজুরি জনু
পীত বসন বনি তায়।
চূড়া শিখি-দল বেড়িয়া মালতীমাল
সৌরভে মধুকর ধায়॥

শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে॥
কিবা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন-ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায়॥
এ তিন ভুবনে যত রস-সুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া পেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে॥ —তরু. ৭৭৮

টীকা: শ্যামের দেহ নবীন মেঘের মতন; আর তাঁহার পীতবাস যেন স্থির বিদ্যুৎ। উপজায়—জন্মে। নিছিয়া পেলিয়ে—নির্মঞ্ছন করিয়া ফেলি।

১০৮. বদন-চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না কুন্দিলে[১] দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী॥ ১॥
রতন[২] কাটিয়া কত যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া[৩] দিল কানে।
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী[৪] হৈল উহার ধেয়ানে॥ ২॥
নাসিকা[৫] উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো
সোনায় বান্ধিল[৬] তার পাশে।
বিজুরি জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে রহি[৭] হাসে॥ ৩॥
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার ভাঁতি।
হিয়ার ভিতরে[৮] মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি॥ ৪॥
মদন ফাঁদ ও না চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়াছে[৯] কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুই না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥ ৫॥

কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগ পাও।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গাইয়া ভাঙ্গাইয়া তাহা খাও ॥ ৬ ॥
করিবর-কর জিনি[১০] বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
তাহার[১১] পরশ রস মাগে ॥ ৭ ॥
ঠমকি[১২] ঠমকি যায় তেরছ নয়নে চায়,
যেন মত্ত গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয় ও রূপ লখিল নয়
রূপসিন্ধু গড়ল বিধাতা ॥ ৮ ॥

—১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিত অনুরাগবল্লী পৃ ৩২ ;
ভক্তিরত্নাকর পৃ ৪৮২, তরু. ৭৯০

অনুরাগবল্লীতে অষ্টম কলি নাই। পদকল্পতরুতে ১, ২, ৬, ৫, ৩, ৭, ৮ এইরূপ ভাবে সজ্জিত আছে।

পাঠান্তর—১. কুন্দিলে—তরু.। ২. রতন কাড়িয়া অতি—তরু.। ৩. গড়িয়া —অনুরাগবল্লী, তরু.। ৪. যোগী হবে। তরু.তে দ্বিতীয় কলির পরে আছে—

অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি পাও।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও ॥

৫. নাসিকার আগে দোলে—তরু.। ৬. জড়িত। ৭. থাকি। চতুর্থ কলিটি তরু.তে নাই। ৮. মাঝারে—ভক্তিরত্নাকর। ৯. শিখিয়া আইল কোথা—তরু.। ১০. করভের কর জিনি—তরু.। ১১. উহারি। ১২. নাটুয়া ঠমকে যায়—তরু.।

টীকা: কুন্দারে—কাঠ কুন্দিয়া যে মিস্ত্রি কাজ করে। বিজুরি জড়িত ইত্যাদি—সোনা বাঁধানো গজমুক্তাকে বিদ্যুৎমণ্ডিত চাঁদের কলিকার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, আর কৃষ্ণের রঙ মেঘের মত বলিয়া উহাকে 'মেঘের আড়ালে থাকি হাসে' বলা হইয়াছে।

বাহিরের সৌন্দর্য অন্তরে কি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে, পদটিতে তাহা সুন্দররূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ইহার শ্রেষ্ঠ কলি হইতেছে—

যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে।

১০৯. নীল রতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা॥
কদম্বের তলে সেই শ্যাম চিকণিয়া।
রূপ দেখি আইনু জাতি-কুল মজাইয়া॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা॥
বদন-কমল কিয়ে পূনমিক চাঁদ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলী গানে।
ভুলল আঁখির লাজ সান্ধাইল কানে॥
নয়ান যুগল কিয়ে মত্ত অলিরাজ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া-মাঝ॥
গোবিন্দ দাস কহে সে না দিঠি বিষে।
না পীলে অধরসুধা কেবা জীয়ে আশে॥ —পদা.সমুদ্র পৃ ৩৮

টীকা: রূপ দেখিয়া প্রশ্ন জাগে—এ কি নীল রতন, না নবীন মেঘের সমাবেশ? সে অঙ্গের ছটা দেখিবার চেষ্টা করিলেও ভাল করিয়া দেখা যায় না। সান্ধাইল কানে—কানে প্রবেশ করিল। মদন মহেন্দ্র ধনু—ইহা কি ইন্দ্রধনু, না মদনের ধনু? অথবা মদন শব্দকে বিশেষণ করিয়া মনোহর ইন্দ্রধনু। দিঠি বিষে—সেই দৃষ্টির বিষ। না পীলে অধরসুধা ইত্যাদি—সেই অধরসুধা পান না করিলে কেহই এই দংশনের বিষ হইতে বাঁচিবার আশা করিতে পারে না।

১১০. কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরমবেদন
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি

সখী সঙ্গে যদি জলেরে যাই
সে কথা কহিল নয়।
যমুনার জল মুকত কবরী
ইথে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ
কহিল সভার আগে।
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে॥ —সা. প. ২০১ পুথি, অ. ৪১০

টীকা: যমুনার জল মুকত কবরী ইত্যাদি—একে যমুনার জল কালো, তারপর আবার রাধার মুক্ত কবরীর সুকৃষ্ণ কেশরাশি, এত কালোরূপ দেখিয়া কি আর মন ঠিক রাখা যায়?

সম্ভবত এই রামচন্দ্র গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ।

১১১. এ সখি এ সখি কর অবধান।
পুন কি অনঙ্গ অঙ্গ ভেল নিরমান॥
অলকা-আবৃত মুখ মুরলি-সুতান।
রমণি-মোহন চূড়া আনহি বন্ধান॥
সুন্দর নাসিকা পুট ভাঙ-কামান।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিখয়ে বাণ॥
অধর সুরঙ্গ ফুল বান্ধুলি সমান।
হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ॥
তিলেকে হরয়ে কুল-কামিনি মান।
রায় বসন্ত ইছে নিছিতে পরাণ॥ —তরু. ২৪৫৩

টীকা: পুন কি অনঙ্গ অঙ্গ—মহাদেবের কোপে মদন তো অনঙ্গ হইয়াছিল, সে কি আবার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিল? ভাঙ—ভ্রূ, কামান অর্থাৎ ধনুকের তুল্য। অপাঙ্গ—কটাক্ষ। বরিখয়ে বাণ—কটাক্ষরূপ বাণ বর্ষণ করিতেছে। সুরঙ্গ—সুন্দর লাল রঙ। নিছিতে—উৎসর্গ করিতে। ইছে—ইচ্ছা করে।

১১২. সজনি, কি হেরিলুঁ ও মুখ শোভা
অতুল কমল সৌরভ শীতল
তরুণী-নয়ন অলি-লোভা॥

প্রফুল্লিত ইন্দী- বর বরসুন্দর
মুকুর-কান্তি মনমোহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত
কিয়ে নিরমল ছবি-শোহা॥
বরিহা-বকুলফুল অলিকুল আকুল
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি-কুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান॥
হাসিখানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিলুঁ তায়॥
না দেখিলে প্রাণ কান্দে দেখিলে না হিয়া বান্ধে
অনুখন মদন-তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ॥
চরণে নূপুর-মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
রমণিক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ সাগরে রস- হিলোলে নয়ন মন
আটকিল রায় বসন্ত॥ —তরু, ২৪৫২

টীকা: অতুল কমল ইত্যাদি—মুখের শোভা অনুপম কমলের মত, সেই কমল যেমন সুগন্ধি, তেমনই শীতল; তাহাতে তরুণীদের নয়নরূপ ভ্রমর লুব্ধ হইয়াছে। ইন্দীবরবর—শ্রেষ্ঠকমল। মুকুরকান্তি—এমন লাবণ্য যে তাহাতে যেন মুখ দেখা যায়। মনমোহা—মনকে মুগ্ধ করে। থকিত—স্থগিত। ছবি-শোহা—ছবির মতন শোভা। বরিহা—বর্হ, ময়ূরপুচ্ছ। অবতংস—কানের অলঙ্কার। আটকিল—আটকা পড়িল।

নবম স্তবক

আক্ষেপানুরাগ

২১৩. আরে মোর গৌরকিশোর।
পুরুব প্রেমরসে ভোর॥

স্বরূপ দামোদর রামরায়।
করে ধরি কয়ে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদগদ ভাব।
ঘন বহে দীঘ নিশ্বাস॥
মরম না বুঝে কেহো মোর।
কহে পহু হইয়া বিভোর॥
কেনে বা এ প্রেম বাঢ়াইলুঁ।
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ॥
নিঝরে ঝরয়ে দু নয়ান।
নরহরি মলিন বয়ান॥ —তরু. ৮৪০

টীকা: নীলাচল-লীলায় স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন ইঁহাদের সঙ্গেই তিনি লীলাকীর্তনের রস আস্বাদন করিতেন।

১১৪. কিবা হৈল সই মোরে কাহ্নুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কাহ্নু লাগি ঝুরে॥
যে না জানে এ না রস সেই আছে ভাল
মরমে রহল মোর কাহ্নু প্রেম শেল॥
নবীন পাউখ মীন মরণ না জানে।
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
আগমে পিরিতি মোর নিগমের সার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িলু পাথার॥ —পদ. সমুদ্র পৃ ৪২৭

কীর্তনানন্দে (পৃ ২৮৬) এই পদ চণ্ডীদাস ভণিতায় আছে—

নিগূঢ় পিরিতি আগুনের ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥

ড. সুকুমার সেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৯৮২ সংখ্যক পুথিতে পদটি নরহরি ভণিতায় পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সা.কু. এবং ক.বি. ২৯৩ পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায়, ঢা.মি. ৫ দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ও ক.বি. ২৯৮ পুথিতে শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় এবং ১৬৬৩ শকের অনুলিখিত ঢাকা মিউজিয়ামের এক পুথিতে জ্ঞানদাস ঠাকুরের নামে পাইয়াছেন।

১১৫. না জানিয়া না শুনিয়া পিরিতি বাড়ালু গো
পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে
এমতি ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো
মনের আনলে আমি পুড়ি।
জ্বলন্ত আনলে যেন পুড়িয়া রহিয়াছি গো
পাকানিয়া পাটের ডোরি॥
আঁধুয়া পুখরে যেন দীনহীন মীন রহে
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞি।
বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতিয়া পিরিতি গো
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই॥

—পদা. সমুদ্র পৃ ৪২৬

টীকা: হের যে আমারে দেখ ইত্যাদি—বাহির হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে না যে, আমার ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশ হইয়াছে। আমি মনের আগুনে পুড়িতেছি; পাক দেওয়া পাটের দড়িতে আগুন ধরাইয়া দিলে, আস্তে আস্তে তার সবটাই পুড়িয়া যেমন ছাই হইয়া যায়, আমার শরীরও সেইরকম হইতেছে। আঁধুয়া পুখর—এঁদো পুকুর। তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই—প্রতি তিলে (মুহূর্তের খণ্ডাংশে) ভয় হয়, এই বুঝি বন্ধুকে হারাইলাম।

১১৬. সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন-পুতলী করি লইলুঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥—পদা.স. পৃ ২৪৭, তরু.৭৫১

টীকা: স্রোত বিথার জলে ইত্যাদি—আমি তো প্রেমে পড়িয়া জীয়ন্তে মরা হইয়াছি; বিস্তৃত স্রোতজলে আমার দেহ ভাসিয়া যাইতেছে; দুই কুলের কুকুরেরা উহা টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু প্রেমরূপ নদীর বিস্তৃত স্রোতজল এত গভীর যে উহারা নিকটে আসিতে পারিতেছে না—পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কুকুরে আমাকে ধরিতে পারিবে না। পিরিতি এমতি হৈলে / তার গুণ তিন লোকে গায়—প্রেম যদি এইরূপ লোক ও সমাজের অপেক্ষা না রাখে, নিজের দেহের ও প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার গুণ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন লোকে গান করে।

মুরারি গুপ্ত রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। পরকীয়া-প্রেমের এই পদটি বিশ্বম্ভর মিশ্রের কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

১১৭. নয়নে লাগিল রূপ কি আর কহিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
নবীন পাউখের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈর্য নাহি মানে॥
চিতের আগুন কত চিতে নিভাইব।
না যায় কঠিন প্রাণ কাহে কি বলিব॥
জানিলে যাইতাম না মরমসখী সনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে।
নিরবধি পড়ে মনে শয়নে সপনে॥
ঘরে পরে সব জনে কররে গঞ্জনা।
বংশীবদনে কহে না কর ভাবনা॥ —অপ্র. পদরত্না. পৃ ১১২

টীকা: নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব—যে অনুরাগ নিত্যই নূতন নূতন রূপ ধারণ করে তাহাই প্রেম। সেই প্রেমের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া যাইয়া আমার প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। পাউখ—পাউস, প্রাবৃষ, বর্ষাকাল।

১১৮. সভে বলে সুজন-পিরিতি যেন হেম।
বিষম হইল মোরে কালিয়ার প্রেম॥

এ ঘর বসতি মোরে লাগে যেন শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
যতেক পিরিতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজর-কাঁটা যে বল্যাছে বাণী।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুঞা চাহি চৌখে চৌখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
বলরাম দাস বলে না ভাব সুন্দরি।
শ্যামসুন্দরের প্রেম সুধার লহরী॥ --অপ্র. পদরত্না. পৃ ৫৭

১১৯. দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়িয়া লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি॥—তরু. ৮১৭

টীকা: জিতে পাসরিতে নারি—জীবন থাকিতে তোমার প্রেম ভুলিতে পারি না।

১২০. আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী
কোন বিহি সিরজিল ছার কুলনারী॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাঙ চাঁদ সুরুজের মুখ॥
কহ সখি, কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধরায়॥

ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥
আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥
ভাবে বিভোর তনু গদগদ বাণী।
ধরিতে ধরণে না যায় ছুটি চোখের পানি॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥ —তরু. ৮৩৮

১২১ শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরানি॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থির॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥
—কর্ণানন্দ পৃ ১৯ ; ভক্তিরত্নাকর পৃ ৫৮২

টীকা: শুনিয়া দেখিনু কালা—কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিলাম। আসিয়া উঠায় তবে—যখন আমি ঘরে বসিয়া থাকি, তখন যেন সে আসিয়া আমাকে জোর করিয়া যমুনাতীরে অভিসারে লইয়া যায়। গৃহপতি—সে শুধু ঘরেরই মালিক, আমার হৃদয়ের নহে।

১২২. মনের মরম-কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী ত্রুটি আঁখি কান্দে॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥ —তরু. ৯২৩

[illegible] আলো মুঞি জানো না,
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা॥
কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হইঞা ত্রুকুলে দিলুঁ ত্রুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥ —তরু. ১২৩

টীকা: রূপের পাথারে আঁখি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেন অমৃতের পাথার বা সমুদ্র; সেই রূপ নয়নে লাগিয়া যেন আঁখিকে রসের সাগরে ডুবাইয়া রাখিল। যৌবনের এমন অপরূপ শোভা যে, একবার তাহাতে মন লাগিলে আর উহা ফিরিয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পায় না। ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান—যে পথে শ্যামসুন্দরের দেখা মিলিয়াছে, সেই পথ ছাড়িয়া ঘরে যাইতে পা চলে না; সেই পথ যেন ফুরায় না মনে হইতেছে। কোঁড়া—কুঁড়ি।

১২৪. গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন তাহে শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন॥

তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল ॥
আমার মিনতি শত, না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেভার ॥ —তরু. ৮২৬

টীকা : উভ হাতে—দুই হাত জোড় করিয়া।

১২৫. বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জন
ইহা কি পরাণে সয় ॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া ॥
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমনি হউক সে ॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ ॥ —তরু. ৯৬১

পদটি সংকীর্তনামৃতে (৩৯১) নরহরি ভণিতায় এবং কীর্তনানন্দে চণ্ডীদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। আমার সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' (সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) ৬৭-৭২ পৃষ্ঠায় ইহার বিচার দ্রষ্টব্য।

এই পদটির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটির অনেক মিল রহিয়াছে—

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

সে বঁধু কালিয়া   না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর   যেমন করিছে
তেমনি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া   সব তেয়াগিলু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি   ছাড়িয়া পিরিতি
আর জানি কার হয়॥
যুবতী হইয়া   শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ   যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥
—রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ পৃ ১০৯৭

রসোদ্গারান্তে অনুরাগ

১২৬. সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু-   রাগ বাখানিয়ে
অনুখণ নৌতুন হোয়॥ ধ্রু॥
জনম অবধি হৈতে   ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম   হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা॥
বচন-অমিয়া-রস   অনুখণ শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পরশ না ভোল।
কত মধু-যামিনি   রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥
কত বিদগধজন   রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবিবল্লভ   হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি॥   —তরু. ৯৩৭

সারদাচরণ মিত্র মহোদয় এই পদটি বিদ্যাপতি ভণিতায় পাইয়াছিলেন। যিনিই ইহা লিখুন তিনি যে উচ্চস্তরের কবি ছিলেন সন্দেহ নাই। রসকদম্ব-এর লেখক

কবিবল্লভ অথবা নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য বল্লভদাসের পক্ষে এ ধরনের পদ লেখা সম্ভব মনে হয় না। অথচ 'সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিয়ে / অনুখণ নৌতুন হোয়' অর্থাৎ সেই প্রেমকেই অনুরাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করি যাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন বলিয়া মনে হয়—এই ভাবটি শ্রীরূপের প্রদত্ত অনুরাগের সংজ্ঞার যেন অনুবাদ। উজ্জ্বলনীলমণিতে (১৪।১৪৬) আছে :—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

অর্থাৎ, যে রাগ নবনবায়মান হইয়া সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায়, প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে—তাহাকেই অনুরাগ বলে। সেইজন্ত পদটি কোন চৈতন্যোত্তর কবির রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন।

দশম স্তবক

অভিসার

১২৭. বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গোঁসাই
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর অতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এহেন সম্পদকালে গোরা না ভজিলাম হেলে
তছু পদে না করিলাম আশ।
চৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ —তরু. ৩২৫

১২৮. এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আর পয়োধর গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর
কোলে মিলল জোর॥
মাধব, তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদ চালন করত সুন্দরী
বাহির দেহলি মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চান্দ পূজল কাম॥
শ্রীযুত হসন জগত-ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান॥ —রসমঞ্জরী পৃ ৮

টীকা: শ্রীরাধা প্রসাধন করিতেছিলেন, বুকে চন্দন ও নয়নে কাজল লাগাইতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, মাধব তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইবেন। অমনি প্রসাধন করা ছাড়িয়া দিয়া তিনি বাড়ীর দেউড়ীতে আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। তিনি এক স্তনে চন্দন দিয়াছিলেন, অন্য স্তন খালিই থাকিল। চন্দনচর্চিত স্তনের সঙ্গে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের ও অপর স্তনের সহিত স্বর্ণবর্ণের পর্বতের তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, উভয়ে যেন রাধার কোলে মিলিত হইল। রাধার দক্ষিণ চক্ষুতে কাজল পরা হইয়াছিল, অন্য চক্ষু সাদাই রহিল। দুই চক্ষুকে নীল পদ্ম ও শ্বেত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, কামদেব যেন ঐ দুইটি পদ্ম দিয়া রাধার মুখরূপ চন্দ্রকে পূজা করিল।

হুসেন শাহের রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ।

১২৯. রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেল উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচরি রাই বান্ধে কেশভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজপাতা॥

শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশীবদনে কহে যাঙ বলিহারি।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥ —তরু. ১০০৯

১৩০. গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ-পাতন- শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নি- তান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থরথর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জিবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর- বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥ —তরু. ৯৮৪

১৩১. ঝরঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি-অভিসার॥
অন্তরে শ্যাম-চন্দ পরকাশ।
মনহি মনোভব লেই নিজ পাশ॥
কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝনঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান॥

ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিনি বিথার॥
চঢ়ব মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম॥
মন মাহা সাখি দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধনি কর অভিসার॥ —তরু. ৯৮৫

১৩২৮ কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনি
তিমির পয়ানক আশে।
করকঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ —তরু. ১০০১

শব্দার্থ: মঞ্জীর—নূপুর। চীর—বস্ত্রখণ্ড। দূতর—দুস্তর। করকঙ্কণ পণ—হাতের কঙ্কণ মূল্যস্বরূপ দিয়া। ভুজগ-গুরু—সাপুড়ে।

টীকা: রাধা অন্ধকার রাত্রিকালে সর্প ও কণ্টকপূর্ণ পথে অভিসারে যাওয়ার অভ্যাস করিতেছেন। বাড়ীর উঠানে কাঁটা পুতিয়া দিয়াছেন, আর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া উঠান পিছল করিয়াছেন। রাত্রিকালে সকলে যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন রাধিকা রাত্রি জাগিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উঠানে চলিয়া দুস্তর পথে অভিসারে যাওয়ার অভ্যাস করিতেছেন। আঁধারে চলিতে শিখিবার জন্য বাড়ীতে দুই হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া চলিতেছেন। পথে চলিতে চলিতে সাপের মণি দেখিতে পাইলে, সেই মণির আলোকে পাছে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে কি করিয়া সাপের মুখ বাঁধিতে হয়, তাহা সাপুড়েদের কাছে শিখিতেছেন। সাপুড়েরা বিনামূল্যে তাহা শিখাইতে রাজি হইবে না, অথচ ঘরের বউ রাধাকে

হাতে নগদ পয়সাকড়ি নাই; তাই তিনি সাপুড়েকে হাতের কঙ্কণ পণ দিয়া সাপের মুখ বাঁধিবার মন্ত্র ও কৌশল শিখিতেছেন। গুরুজনের কথা তাঁহার কানে পৌঁছায় না, মনে হয় যেন তিনি কালা হইয়া গিয়াছেন। এক কথা শুনেন, অন্য জবাব দেন। আর পরিজনদের কথায় বোকার মতন কিছু না বুঝিয়াই ম্লানভাবে একটু হাসেন। রাধার যে সত্যই এই ভাব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বা সাক্ষ্য দিতেছেন কবি গোবিন্দদাস।

পদটি যে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে সঙ্কলিত জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকটির ভাব লইয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখাইয়াছেন—

মার্গে পঙ্কচিতে ঘনান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারণং
গন্তব্যোঽদ্য ময়া প্রিয়স্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রোল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি॥ —সূ.মুক্তা পৃ ২৪৭

ইহাতে নিজের বাড়ীতে করতলে চোখ ঢাকিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া পথ চলিবার অভ্যাস করার কথা ও নূপুরের যাহাতে শব্দ না হয়, সেই জন্য উহাকে হাঁটুর উপরে তোলার কথা আছে। কিন্তু রাত্রি জাগিয়া ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া উঠান পিছল করিবার কথা নাই। আর গুরুজনের কথায় বধিরসম হওয়ার ও পরিজনদের কথায় মুগ্ধার মতন (বোকার মতন) হাসিবার কথা নাই। গোবিন্দদাস প্রাচীন কবিতার ভাব লইয়া পদটি লিখিলেও নিজের মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

১৩৩. মন্দির-বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনি পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ —তরু. ৯৮৭

টীকা : সখী শ্রীরাধাকে অভিসার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন যে, বাধা অনেক। প্রথমতঃ, দরজা শক্ত করিয়া বন্ধ রহিয়াছে, বাহির হওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, পথে কাদা জমিয়াছে, সেই জন্য চলা কঠিন। তৃতীয়তঃ, খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তোমার নীল শাড়ীতে আর কত জল ঠেকাইবে? চতুর্থতঃ, হরি মানসগঙ্গার অপর পারে রহিয়াছেন—সে অনেকটা পথ। পঞ্চমতঃ, ঘন ঘন বজ্র পড়িতেছে, দশ দিক্ বিদ্যুতের আলোকে ঝলসিয়া যাইতেছে। এত বাধা সত্ত্বেও যদি তুমি ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হও, তবে প্রেমের জন্য তোমাকে দেহ উপেক্ষা করিতে হইবে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহাতে ভাবিবার কি আছে? যে তীর ছোঁড়া হইয়াছে, তাহাকে কি শত চেষ্টা করিলেও ফেরানো যায়? মন যে দয়িতের নিকট চলিয়া গিয়াছে; তাহা কি আর ফিরাইয়া আনা যায়?

১৩৪. কুলবতি কঠিন কবাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কণ্টক বাধা
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে ডারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি, মঝু পরিখন করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে জলদজল লাগি।
প্রেম দহনদহ থাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥ —তরু. ৯৮৮

টীকা : পূর্বোক্ত পদের উত্তরে শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—তুমি আমাকে পথে কণ্টকের ভয় কি দেখাইতেছ? যে কুলবতী হইয়া ঘরের কঠিন কপাট খুলিয়াছে, সে কি কাঁটার ভয় করে? তুমি নদীতে অগাধ জল আছে বলিয়া পার হওয়া যাইবে না বলিতেছ, কিন্তু নিজের কুলমর্যাদাকে যে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার কাছে নদীর জল আর অগাধ কি? সখি, আমাকে আর পরীক্ষা করিও না। আমি হরিকে সঙ্কেত করিয়াছি, তিনি আমার পথ চাহিয়া রহিয়াছেন; সেই কথা মনে করিয়া আমার মন কাঁদিতেছে। যাহার উপর মদন কোটি

কামবাণ নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার আবার বর্ষার ধারায় কি ভয়? বজ্র পড়িবে বলিতেছ? পড়ুক না; যাহার হৃদয় প্রেমের দহন সহ্য করিতেছে, সে বজ্রকে কি ভয় করিবে?

পদটি শ্রীরূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিত—

লজ্জৈবোদ্ঘাটিতা কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতিঃ
মর্য্যাদৈব বিলঙ্ঘিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা।
আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেষা তনুঃ॥

যখন আমি লজ্জাই উদ্ঘাটিত করিয়াছি, তখন এ স্থানে বদ্ধ কবাট থাকাতে আমার কি হইবে? যখন আমি মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি, তখন সামান্য যমুনা আমার কি করিবে? খলজনের দৃষ্টিই যখন অগ্রাহ্য করিয়াছি, তখন সর্পসকল আমার কি করিবে? যখন আমি তাঁহাকে প্রাণই সমর্পণ করিয়াছি, তখন শরীর সমর্পণ করিব, তাহাতে আর কি কথা?

১৩৫. অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছল মনহি মনোভব সিন্ধু॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভ ক্ষণে ভেল বাদর অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
দূর কর সোতিনী মোতিম হার॥
চলইতে দীগভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥ —তরু. ৩৪২

শব্দার্থ: অম্বরে—আকাশে। ডম্বর ভরু—গড় গড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে; যেন শিবের ডম্বরু বাজিতেছে। নব মেহ—নূতন মেঘ; ব্যঞ্জনা: যেন নবঘন-শ্যাম ডাকিতেছে। গোয়—গোপনে।

টীকা: অন্তরে শ্যামরূপ চন্দ্র যেন উদিত হইল। চাঁদ উঠিলে সমুদ্রে জোয়ার আসে, তাই শ্যামচন্দ্রের উদয়ে মনে মদনসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল। মৃগমদে দেহ

অনুরঞ্জিত করিলে ও নীল শাড়ী পরিলে আঁধারে আমার গৌরবর্ণ ঢাকা পড়িবে, কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমার কাঁচলি দূর কর, উহা তো ভার মাত্র। আর মোতির হার তো সতীন; কেন না, শ্যামবন্ধুর আলিঙ্গন হারের উপর লাগিবে, আমি পাইব না। শ্রীরাধার পাছে আঁধারে দিক্‌ভ্রম হয়, তিনি পথ হারান, এই ভয়ে সখীর অনুগা কবি গোবিন্দদাস গোপনে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন।

১৩৬. পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিগে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥
পরিহরি তৈছন সুখময় সেজ।
উচ-কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ॥

—পদামৃতসমুদ্র ১৩৮৯; তরু. ৩২৬; কী. ২১৮

টীকা: শীতকালে জ্যোৎস্না-রাত্রিতে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণিত হইতেছে। পৌষ মাসে রাত্রিকালে ধীরে ধীরে হাওয়া বহিতেছে। চারি দিকে তুষারপাত হইতেছে, তাহাতে হিমকর চন্দ্র বা চন্দ্রের কিরণ যেন বন্ধ হইয়াছে। ঘরের ভিতরেই সকলে কাঁপিতেছে। সকলেই শীতের চোটে শুইয়া আছে, চোখ বুজিয়া আছে, যেন চোখ খুলিলেই আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে। এমন সময়ে রাধা অভিসারে বাহির হইল দেখিয়া আমার মনে চমক লাগিল। সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়া রাধা মনের ভ্রমে উচ্চ কুচের কঞ্চুকও ছাড়িয়া একখানি সাদা কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া কুঞ্জাভিমুখে বাহির হইল। সাদা কাপড় পরার উদ্দেশ্য এই যে, জ্যোৎস্নার শুভ্রতার সঙ্গে একীভূত হওয়ায় কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না। রাধা কোমল চরণ দুখানি তুষারের উপর দিলেন না, তিনি কাঁটার উপর দিয়া চলিতে টলিলেন না। যেখানে নূতন অনুরাগ, সেখানে বিঘ্নকে কে গণনা করে?

১৩৭. রাই কনক-মুকুর-কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতেক ভাতি॥
নীল বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
হেলি দুলি চলি যায়।
আধ ওড়নি ঈষত হাসিয়া
বঙ্কিম নয়নে চায়॥
সিথায়ে সিন্দুর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে অরুণ-কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
শ্যামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ-ভবনে
কলপ-তরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম নাগরের কোরে॥

—তরু. ১০২৬; কী. ১৯৩

একাদশ স্তবক

উৎকণ্ঠিতা

১৩৮. কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পুরুব-দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ-রসে ভেল ভোরা॥ -তরু. ৩১২

১৩৯. এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া॥
সই, কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ ভরে॥
এহেন রজনী কেমনে গোঙাব
বঁধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বঁধুর সনে। —তরু. ৩৪৪

১৪০. ভুজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি, কি ফল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু-পিরীতি অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল
ভাও ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহ এ দুহুঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারি॥—পদা.সমুদ্র পৃ ১৬১ ; তরু.৩৪৬

শব্দার্থ : ভুজগ—সর্প। কুলিশ—বজ্র। বিঘিনি বিথার—বিঘ্ন বিস্তৃত। যতয়ে মনোরথ—যত কিছু অভিলাষ। অনরথ—অনর্থ। ভাও ভুজঙ্গিনী পাশ—ভ্রূরূপ ভুজঙ্গিনীর পাশের দ্বারা বন্ধন করিল।

টীকা: দারুণ ফুলশর ইত্যাদি—আমি কুঞ্জে আসিলাম, সেখানে মদনের দারুণ ফুলশর। ওদিকে কৃষ্ণ হয়তো গুরুজনের গালির ভয়ে অভিসারে আসিতে পারেন নাই। কবি বলিতেছেন, তোমার উভয় সংশয়ই মিথ্যা; রসিক মুরারি আসিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি কোন কলাবতীর কটাক্ষে বাঁধা পড়েন নাই, আর গুরুজনদের গালির ভয়েও পিছপাও হন নাই।

১৪১. পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
শবদহিঁ সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরখয়ে
জানল আয়ল কান॥
মাধব, সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপলি
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥
পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
পুন অনুমানয়ে চীতে।
ভুলল পন্থ অন্ত নাহি পায়ল
না বুঝিয়ে নাগর রীতে॥
নূপুর রণিত কলিত নবমাধুরি
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহি কানুরাম দাস॥ —তরু. ৩৩২

টীকা: রাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় থাকিবার পর বাতাসে গাছের পাতা নড়ায় মনে করিলেন, কৃষ্ণ বুঝি আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া চারি দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিতেছেন—'বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি তমাল গাছের পিছনে লুকাইয়াছ; এখন আর কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকিবে?' কিন্তু অনেকক্ষণ বাদেও কৃষ্ণ যখন বাহির হইলেন না, তখন ভাবিতেছেন, তাহা হইলে কি কৃষ্ণের পথ ভুল হইল?' আবার মনে হইল, ঐ বুঝি তাঁহার নূপুরের রণধ্বনি শুনা যাইতেছে। আনন্দিত মনে রাধা কাননের পানে চাহিতে লাগিলেন। জয়দেবের 'পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের ছায়া এই পদে দেখা যায়।

১৪২. মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলুঁ
কানু মিলন-প্রতিআশে।

আভরণ বসন অঙ্গে সব সাজল
তাম্বুল কর্পূর বাসে ॥
সজনি, সো মুঝে বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে
সো নাহি দরশন দেল ॥
ফুলশরে জরজর সকল কলেবর
কাতরে মহি পড়ি যাই।
কোকিল বোলে ডোলে ঘন জীবন
উঠি বসি রজনি গোঙাই ॥
শীতল ভবন গরল সমান ভেল
হিমাচল বায়ু হুতাশ ॥
লোচনে নীর থীর নাহি বান্ধয়ে
কান্দয়ে কানুরাম দাস ॥ —তরু. ৩৩৪

শব্দার্থ: পৈঠলুঁ—প্রবেশ করিলাম। প্রতিআশে—প্রত্যাশায়। ফুরে—স্ফুরিত হয় বা প্রকাশ পায়। ডোলে ঘন জীবন—প্রাণ যেন বারংবার (ঘন) দুলিয়া উঠিতেছে। হিমাচল বায়ু হুতাশ—হিমালয়ের তুষার-শীতল বাতাস আগুনের মতন লাগিতেছে। কান্দয়ে কানুরাম দাস—কবিও নায়িকার সঙ্গে একাত্ম হইয়া কাঁদিতেছেন।

১৪৩. রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার।
গাহক না আয়ল যৌবন ভেল ভার ॥
বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই ॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়।
হিমঋতুপবনে মোর হিয়া চমকায় ॥
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায় ॥
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
কানুরাম দাসের তনু ধূলায় লোটায় ॥ —তরু. ৩৩৫

টীকা: বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়—চন্দ্র সাধারণতঃ প্রেমিকজনকে আনন্দ দেয়। কিন্তু প্রিয়ের আগমন হইল না বলিয়া সেই চন্দ্র আমার কাছে বিষের মতন লাগে, আর তাহার কিরণে দেহ শীতল না হইয়া বরং পুড়িয়া যাইতেছে।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে (পৃ ২৫) গোবিন্দদাস ভণিতায় একটি পদের

প্রথমে এই পদের প্রথম দুই চরণ পাওয়া যায়। ঐ দুইটি চরণ ছাড়া অন্য কয়েকটি চরণের সঙ্গেও এই পদের সহিত মিল দেখা যায় ; যথা—

বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি কান্দিয়া পুহাই॥
... ...
দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীতি গায়॥

শেষ দুই চরণ—

ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
গোবিন্দদাসের তনু ধরণী লোটায়॥

১৪৪. বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আসি এ বেশ বনাইলু গো
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনি আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথি॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পূরিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব।
এ নব মালতী মালা বৃথাই গাঁথিলুঁ গো
কেমনে রজনী গোঙাইব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ্ঞ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥ —তরু. ৩৬৩

শব্দার্থ : খপুর—সুপারি, গুয়া—সুপারি।

১৪৫. তুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনিক বিরহ-তরঙ্গ॥

যৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছন অমিয়া সাগরে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর॥
বিকসিত সুকুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল ঝলমল কুঞ্জ কুটীর॥
বিহরয়ে রাধা মাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥ —তরু. ৩২৩

টীকা: লুঠল—লোটাইল, পূর্বে যেমন বিরহরূপ জ্বরে ভূমিতে পড়িয়াছিল, এখন তেমনি মিলনের আনন্দে যেন অমৃতসাগরে অবগাহন করিতেছে।

দ্বাদশ স্তবক

খণ্ডিতা

১৪৬. আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়।
পুরব প্রেমভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদগদ হিয়া॥
জানলু তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গরগর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ॥
কহে নরহরি রাধা ভাবে হৈল হেন।
পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন॥

১৪৭. চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥
হাম বনচারী বঞ্চি একেশ্বরিয়া।
চাতুরী না কর চলহ শঠধরিয়া॥

মিছাহি শপথি না কর মোর আগে।
কেমনে মিটায়বি ইহ রতি দাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত আর॥
বিমুখ ভেল ধনী না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার॥ —তরু. ৪১১

১৪৮. আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দন চন্দ মাঝহি লাগল মৃগমদ
তাহে বেকত তিন নয়না॥
মাধব, অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটনু
দূরহি দূরে রহু সেবা॥
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি দরশনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঞে জরি গেল॥
তবহুঁ বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহ ইহ পর অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি॥ —তরু. ৪০৫ ; সংকীর্তন ৩৭৮

টীকা : সকাল বেলায় অন্য নারীকে উপভোগ করিবার চিহ্ন লইয়া কৃষ্ণ রাধার সামনে আসিলে, রাধা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া শঙ্করের সহিত তুলনা করিতেছেন। শিবের মতন তাঁহার চূড়ায় চন্দ্র রহিয়াছে—(ময়ূরের পাখায় অঙ্কিত চাঁদ); কপালে আবার সিন্দূরবিন্দু লাগায় উহা আগুনের মতন দেখাইতেছে। চন্দনের মধ্যে মৃগমদকস্তুরীর চিহ্ন লাগিয়া মনে হইতেছে যেন তৃতীয় নয়ন অঙ্কিত হইয়াছে। সম্ভোগের সময়ে চন্দন রেণুতে পরিণত হইয়াছে; তাই মনে হয়, যেন তুমি ভস্ম মাখিয়াছ। শঙ্কর মন্মথকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, এখন তোমাকে দেখামাত্রই আমার মনের মনসিজ সমস্ত বাসনার সঙ্গে পুড়িয়া গেল। কেবল একটি মাত্র ব্যাপারে তোমার সহিত শিবের পার্থক্য দেখিতেছি। শিব দিগম্বর, কিন্তু তুমি এখনও কাপড় পরিয়া আছ কেন? রাধার এই প্রশ্নের উত্তরে কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ঐ কাপড়কে কাপড় না বলিলেও চলে;

কেন না, বসন বদল হওয়ায় উনি পরের কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন। সে কাপড় এত সূক্ষ্ম যে, উহাকে কাপড় বলিয়া না ধরিলেও হয়।

পদটি নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকের ভাব লইয়া যে লিখিত, তাহা ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে দীনবন্ধু দাস 'সংকীর্তনামৃতে' দেখাইয়াছেন—

চূড়াচন্দ্রকমণ্ডিতালকতটে সিন্দূরমুদ্রা-শিখা
তদ্বচ্চন্দনচন্দ্রমধ্যবিলসৎ কস্তুরিকালাচনং।
তেন ত্র্যম্বকতৈব লোকদহনা দগ্ধঃ স মে মন্মথ-
স্তদ্দূরাৎ প্রণমাম্যমাধবমহো ত্বামপ্যদিগ্‌বাসসম্‌॥

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে সঙ্কলিত পদকল্পলতিকায় এই পদটি ক্ষেত্রমোহন দত্তের রচনা বলিয়া উল্লিখিত। ইহা অবিশ্বাস্য।

১৪৯. সহজই গোরি রোখে তিন লোচন
কেশরি জিনি মাঝা খীন।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈলসুতাকর চীন॥
সুন্দরি, অব তুহুঁ চণ্ডিবিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেওবি মোহে আধ অঙ্গ॥
কালী কালিয় ভাউ ভুজঙ্গম
সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে রোখ এত না বুঝিয়ে
ইহাঁ নাহি শুম্ভ নিশুম্ভ॥
দহন মনোভবে তুহুঁ সে জিয়াওবি
ইষত হাস বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডব
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৭১ ; সংকীর্তনামৃত ৩৭৯ ; তরু. ৪০৬

টীকা : রাধা কৃষ্ণকে শঙ্কর বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, এখন কৃষ্ণ রাধাকে গৌরীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, এখন এস, আমরা হরগৌরীর মতন এক-দেহ হই। তুমি গৌরবর্ণা, আবার খুব রাগিয়াছ বলিয়া যেন তোমার কপালে তৃতীয় নয়ন দেখা যাইতেছে। গৌরী সিংহকে জয় করিয়া বশ করিয়াছেন, তোমার ক্ষীণ কটি সিংহের কটিকে পরাজিত করিয়াছে। তোমার মনটি পাষাণের মত কঠিন,—গৌরীর পিতা হিমালয় পাষাণ বলিয়া তোমার হৃদয় এত কঠিন।

তোমার ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণসর্পের কথা মনে পড়ে। উহাদের আস্ফালন সম্বরণ কর। তুমি এত চটিয়াছ কেন? এখানে তো শুম্ভ-নিশুম্ভ নাই যে তাহাদিগকে বধ করিবে। তুমি বলিতেছ যে, মনসিজ দগ্ধ হইয়াছে, তুমি একটু হাসিয়া আমার প্রতি চাহিলেই আবার সেই মদন পুনর্জীবিত হইবে। গোবিন্দদাস প্রমাণ (সাক্ষ্য) দিতেছেন যে, তোমার কৃপা পাইলে সমস্ত ত্রুটি (বাদ) বিদূরিত (খণ্ডব) হইয়া যায়।

এই পদটিরও মূল নিম্নলিখিত এই শ্লোকে পাওয়া যায়—

গৌরী কেশরীমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোচনৈঃ
কাঠিন্যাদ্বিদিতাদ্রিরাজতনয়া কালী ভ্রুবোর্ভঙ্গতঃ।
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্যামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্ধাঙ্গমঙ্গীকুরু॥

১৫০.

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি সারা রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একহি পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ॥
সবে নহে তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতএ চলহ নিজবাস।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৭৪; সংকীর্তনামৃত ৩৮০; তরু. ৪২৩

টীকা: শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করিতে চাহিয়াছেন; তাহার উত্তরে রাধা বলিতেছেন, অর্ধাঙ্গ কেন—তুমি আমি তো একই পরাণ। তাহা না হইলে তোমার বুকে নখের দাগ, আর আমার হৃদয়ে জ্বালা কেন? তোমার ঠোঁটে কাজলের দাগ, তাতে আমার মুখ মলিন কেন? আমি তোমার আসার আশায় সারারাত জাগিয়া কাটাইলাম, তাহাতেই তোমার চোখ দুটি লাল

দেখাইতেছে। আমার কান্না পাইতেছে, তাই তোমার বচন গদ্‌গদ হইয়াছে। দুজনের সবই এক; শুধু আমার রঙটি ফর্সা, আর তোমার কালো। সেইজন্য উভয়ের দৈহিক মিলন হইবে না। তাই তুমি এখন নিজের বাড়ী চলিয়া যাও।

এই পদটিরও মূলস্বরূপ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক দীনবন্ধুদাস সংকীর্তনামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ত্বৎপীনোরসি পাণিজক্ষতমিতো জাজ্বল্যতে মে মনঃ
ত্বদ্‌বিম্বাধরচুম্বিকজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখং।
যামিন্যাং মম জাগরাত্তব দৃশৌ শোণায়মানে ততো
দেহার্ধং কিমু যাচসে হি ভগবন্নেকৈব যন্নৌ তনুঃ॥

১৫১. কাঁহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এব নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদরস এহ॥
ভাবিনি, মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ॥
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক ভাণে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৭৫; সংকীর্তনামৃত ৩৮১; তরু. ৪২৪

টীকা: ধৃষ্ট নায়ক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভর্ৎসনায় লজ্জিত না হইয়া তাঁহার দেখার দোষের কথা বলিতেছেন: এই নবকুঙ্কুমে আঁকা রেখাকে তুমি কিনা নখের চিহ্ন বলিয়া ভাবিলে? মৃদমদকস্তুরী ঘনভাবে লেপন করিয়াছি, আর তুমি কিনা তাহাকে কাজলের দাগ ভাবিলে? হায় হায়, সুন্দরি, এত অল্প বয়সেই তোমার চোখের দৃষ্টি খারাপ হইয়া গেল? রাতকানাও তো বলা যায় না; কেন-না, দিনের বেলাতেই যে তুমি এক জিনিসকে অন্য জিনিস মনে করিতেছ।

একটু গৈরিক চিহ্ন বুকে লাগাইয়াছি, আর তুমি তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আলতার দাগ মনে করিলে? একটু আবীরের বিন্দু লাগাইয়াছি, আর তুমি চাঁদবদনি সুন্দরী মনে ভাবিলে কিনা সিন্দুরের দাগ লাগিয়াছে। তোমার খবর পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছি বলিয়া চোখ লাল হইয়াছে; আর তুমিই কিনা উল্টা আমাকে দোষ দিতেছ?

এটিরও মূল হইতেছে এই প্রাচীন শ্লোকটি—

নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং
ন লাক্ষান্তঃক্রোড়ে পরিচিনু গিরের্গৈরিকমিদং।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতস্থিতিরভূৎ॥

১৫২. ভাল ভেল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝলুঁ বিদগধরাজ॥
নয়নক কাজর অধরহি শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গুপত রহু যামিনী রঙ্গ॥
খনে খনে নয়ন মুদসি আধতারা।
কহইতে বচন রচন আধ হারা॥
যাবক আধক উর পর লাগ।
অনুখন সে ধনী করু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দুরবিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আধি॥ —তরু. ৩৮৫

টীকা: নয়নক কাজর ইত্যাদি—নায়িকার চোখের কাজল তোমার অধরে শোভা পাইতেছে; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন তোমার অধররূপ কমলে একটি ভ্রমর বাঁধা পড়িয়াছে, সে দৃশ্য খুব সুন্দর। মনোলোভার পরিবর্তে মধুলোভা পাঠও দেখা যায়। কহইতে বচন রচন আধ হারা—কথা বলিতে বলিতে যেন অর্ধেক পথে ভুলিয়া যাইতেছে। যাবক আধক উর ইত্যাদি—তোমার বুকের আধখানা জুড়িয়া তাহার পায়ের আলতার দাগ লাগিয়াছে, সেই লাল চিহ্ন যেন সেই সুন্দরীর অনুরাগের প্রতীক। তোমার সুন্দর কপালে তাহার সিঁথির লাল-টুকটুকে সিন্দুর লাগিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তমালবৃক্ষে (কৃষ্ণের শ্যামবর্ণ

বলিয়া তমালের সঙ্গে তুলনা) রক্তবর্ণ প্রবাল ধরিয়াছে। তাহার অনুরাগের ভাবে তোমার দেহ পুলকিত ও সমাধিমগ্ন হইয়াছে মনে হয়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন,· এ যে দেখিতেছি, কৃষ্ণের বিপদ উপস্থিত হইল।

১৫৩. সুন্দরি, কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলু
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ বিন্দু অধরে কৈছে লাগ
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখসি
হাম কাঁহা যাওব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রীতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত॥ —তরু. ৩৭৫

১৫৪. রাই ! কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
যজ্ঞ দান তপ জপ সব তুমি মোর।
মোহন মুরলী আর বয়ানেকা বোল॥
বিনোদিনী হাসিয়া বোলাও।
ফুলশরে জরজর জনেরে জীয়াও॥
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমকো জাদ।
নয়নে কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ॥
সীঁথের সিন্দুর দেখি দিনমণি ঝুরে।
এত রূপ গুণ যার সে কেন নিঠুরে॥
বিনোদিনি ! চাহ মুখ তুলি।
(তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে পরাণ-পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥

হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিলোলি।
পরশিতে করি সাধ (তোর) পায়ের অঙ্গুলি॥
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি।
কানু কাতর বড় রাখহ পিরীতি॥ —ক্ষণদা. ১০।৯

ত্রয়োদশ স্তবক

মান

১৫৫. কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষেণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মানভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥ —তরু. ৫২৫

১৫৬. না কহ না কহ সখি, কহিও আর।
সকল ছাড়িয়া যারে সার করিয়াছি গো
সে ত না হইল আপনার॥
কুল শীল তেয়াগিয়া যার নাম ধেয়াইয়া
জাগি নিশি বসিয়া কাননে।
সে জন আমারে ছাড়ি আনে বিলসয়ে গো
এত কিয়ে সহয়ে পরাণে॥
আমি ত অবলা জাতি আর তাহে কুলবতী
আমরা কি প্রেম-অনুরাগী।
কত প্রেমবতী সনে তাহারি বিলাস গো
সে কেনে মরিবে মোর লাগি॥
শুনিয়া কহয়ে দূতী করযোড়ে করি নতি
ক্ষেম ধনি সব অপরাধ।
কানুরাম দাস কয় মিলন উচিত হয়
প্রেমে পড়িবে পাছে বাদ॥ —তরু. ২০৪৭

১৫৭. চল চল ঢিঠ মিঠ-রস-বঞ্চক
চাতুরী রহু তুয়া ঠামে।
কৈতব বচন- রচনে যব ভুলনু
বুঝনু তুয়া পরিণামে॥
মঞ্জুল হাস ভাষ মৃদু বোলনি
দোলনি নয়ন সন্ধান।
প্রেম-প্রণালী তুহুঁ ভালে জানসি
যৈছন অমিয়া-সিনান॥
করকা-কাঁতিপাতি হাম হেরইতে
ধাওলুঁ মাণিক আশে।
পাণিকো পরশে ডালি পয়ে দূরে গেও
রহল লোক উপহাসে॥
বিষকো কটোর থোর দধি উপর
দেওল দারুণ ধাতা।
কপটহিঁ প্রেম পহিলে হাম না বুঝনু
অনন্ত কহে গুণগাথা॥ —ক্ষণদা. ৯।৮

টীকা: যাও, যাও ধৃষ্ট (ঢিঠ), তুমি মিষ্ট রস দিয়া প্রবঞ্চনা কর; তোমার ছলনা তোমার কাছেই থাক। তোমার মতন ছলের কথার ফাঁদে যখন ভুলিয়াছি, তখন পরিমাণে কি হইবে বুঝিতেছি। সুন্দর হাসি, মৃদুস্বরে কথা বলা, নয়ন নাচাইয়া কটাক্ষ করা, এ সব ভালবাসার ঢঙ তুমি খুব ভালই জান; প্রথমে মনে হয়, যেন অমৃত-সরোবরে স্নান করিতেছি। করকা অর্থাৎ শিলার কান্তিপঙ্‌ক্তি (-সমূহ) দেখিয়া মনে হইয়াছিল, উহা বুঝি মণিমাণিক্য, তাই উহা পাইবার আশায় দৌড়াইয়াছিলাম। কিন্তু হাত দিতেই উপহারের পাত্রের উপর হইতে সব চলিয়া গেল; শুধু লোকের উপহাস মাত্রই রহিয়া গেল। যেন নিদারুণ বিধাতা প্রবঞ্চনা করিবার জন্যই বিষের বাটির উপর একটু দধি রাখিয়া দিয়াছেন।

১৫৮. ধনি তুহুঁ দূতি! ধনি তুয়া কান।
ধনি ধনি সো পিরীতি ধনি পাঁচ-বাণ॥
বিধি মোহে কতই কুবুধি কিয়ে দেল।
তুহুঁ-কুল-তুরযশ-রব রাহ গেল॥
না কহ না কহ ধনি কানুপরথাব।
ঐছন পিরীতি দ্বিগুণ দুখ লাভ॥

পহিলে মিলন মধু-মাখন বাণী।
গগনকো চাঁদ হাতে দিল আনি॥
অব অবধারলুঁ বুঝনু নিদান।
কপট পিরীতি কিয়ে রহে পরিণাম॥
মনকো-মনোরথ মনে ভেল দূর।
যদুনাথ দাস কহে আরতি না পূর॥ —ক্ষণদা. ৯।৪

টীকা : ধনি—ধন্য। দূতি! তুমি ধন্য, তোমার কানুও ধন্য। ধন্য ধন্য সেই প্রেম, আর ধন্য পঞ্চবাণ (কামদেব)। মোহে—আমাকে। বিধাতা আমাকে কি দুষ্টবুদ্ধি দিল যে তাহার সঙ্গে প্রেম করিলাম। তাহার ফলে শুধু দুই কুলে (পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে) কলঙ্কধ্বনি রহিয়া গেল। কানুপরথাব—কানুর প্রস্তাব, কানুর কথা। ঐরূপ ভালবাসায় যতটুকু সুখ পাওয়া যায়, তাহার দুইগুণ হয় দুঃখ। প্রথম মিলনের সময় কত মধুমাখা কথা, যেন আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দিল। এখন নিশ্চয় করিয়া জানিলাম যে আমার নিদান বা শেষ অবস্থা নিকট। কপটের ভালবাসা কি কখনও স্থায়ী হয়? মনের অভিলাষ মনের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল। যদুনাথ দাস বলেন যে, আর্তি পূর্ণ হইল না।

১৫৯. চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরচিত-চোর॥
রূপ গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তুহে পিরিতি-পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন॥ —তরু. ৪৪৬।৫১৩

১৬০. মানিনি, দূর কর দারুণ মানে।
তুয়া বিনে মোহন চীত পুতলি সম
তেজল ভোজন পানে॥

কোমল অমল শেজ কুসুম-দল
তুয়া বিনু তেজল শয়ান।
গন্ধ চতুঃসম অঙ্গ-বিলেপন
তেজল তাম্বুল বয়ান॥
কত কত যুবতী যূথ-শত সেবই
তাহে যে বোধ না মানে।
সো তুয়া লাগি অব সতত উতাপিত
মুন্দি রহত দুই নয়ানে॥
এ ধনি রমণি- শিরোমণি মানিনি
কিয়ে তুয়া মানক কাঁতি।
রায় বসন্ত কত তোঁহে বুঝায়ব
নাহ দেখিলুঁ এক ভাতি॥ —তরু. ৫৫২

টীকা :—এটি দূতীর উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্য অন্নজল (ভোজনপান) ত্যাগ করিয়াছেন; তুমি সেই মোহনের চিত্তপুত্তলীর তুল্য। নাহ দেখিলুঁ এক ভাতি—নাথকে এক কৌশলে দেখিয়া আসিলাম। শ্রীরাধার দূতী নিজেকে প্রকাশ না করিয়া, কৌশলে অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া বলিতেছেন।

১৬১. ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার॥
অমল কুলেতে কালি যেমত দিয়াছি গো
তেমতি পাইলুঁ পুরস্কার॥
গুরু-ভয় তেয়াগিলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
তেজিলুঁ গৃহের সুখসাধ।
সখি, দোষ দিব কারে এতেকে না পাইলুঁ তারে
বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ॥
যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখিজলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া-বিরিখে বিষ ফলে॥
বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ
তেজহ দারুণ অভিমান।
তোমা বিনে সেই কানু ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ২০২

১৬২. রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি
মীলল কানুক পাশ ।
পন্থক শ্রম-ভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশাস ॥
মাধব ! দুর্জয় মানিনি মানি ।
বিপরিত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরায়ে এক আধ বাণী ॥
'কা' বোল বোলইতে শুনই না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি ।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই
বজর শবদ সম মানি ॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু-সম জানি ।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে
কৈছে মিলায়ব আনি ॥
নীল বসন বর নীল চুড়ি কর
পোঁতিক মাল উতারি ।
করি-রদ চুড়ি কর মোতি-মাল বর
পহিরণ অরুণিম শাড়ী ॥
অসিত চিত্র এক উরপর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই ।
মৃগমদ তীলক ধোই দৃগঞ্চল
কুচ-মুখ চন্দনে ছাপাই ॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা ।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল
সবহুঁ ছাপায়লি রামা ॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপে ঝাঁপল
শ্যামরি সখি নাহি পাশ ।
তমাল তরুগণে চুণে লেপায়ল
শিখি পিক্ দূরে নিবাস ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহিঁ উঠি রোখই ।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে
ধাই ধরল হাম যাই ॥

মধুকর ভয়ে ধনি চম্পক তরুতলে
লোচনে জল ভরিপুর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল
টুটি ভৈগেল শতচূর॥
মেরু সম মান কোপ সুমেরু সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পতিপতি অব রাই মানাইতে
আপ সিধারহ কান॥ —তরু. ১৬১

টীকা: রাধার নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া সখী কানুর কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। সে খুব তাড়াতাড়ি গিয়াছিল বলিয়া তাহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল, তাহার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছিল ও তাহার বাক্য গদ্‌গদ হইয়াছিল। সে বলিল—মাধব! রাধার মান তো দুর্জয় মনে হইতেছে! তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম—কোন কথা আর বলিতে পারিলাম না। সে তোমার উপর এতই রাগ করিয়াছে যে, কালো নাম দূরে থাকুক—'কা' শব্দও শুনিতে পারে না। যদি দৈবাৎ কেহ উহা উচ্চারণ করে তো সে দুই কানে হাত দিয়া বন্ধ করে। বজ্রপাত নিবারণের ভয়ে যেমন লোকে জৈমিনিকে স্মরণ করে, তেমনি 'কা' শব্দকে বজ্রতুল্য মনে করিয়া সে জৈমিনি জৈমিনি শব্দ বারংবার বলে। তোমার গুণ সে কানে শুনে না, তোমার রূপকে শত্রুর মতন মনে করে। তোমার যাহারা আপন জন, তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না। এমন অবস্থায় তাহার সঙ্গে কি করিয়া মিলন ঘটাইব বল? তাহার পরনের নীল শাড়ী, হাতের নীল চুড়ি ও পুঁতির মালা দূরে সরাইয়া দিয়া হাতে হাতীর দাঁতের চুড়ি, গলায় সাদা মোতির মালা ও পরনে লাল শাড়ী লইয়াছে! তাহার বুকের উপর আঁকা এক কালো ছবি ছিল, তাহা চন্দন দিয়া ঢাকিয়া মুছিয়া দিয়াছে। নয়নকোণে ও কুচের মুখে কালো মৃগমদকস্তুরী ছিল, তাহা ধুইয়া চন্দন লাগাইয়াছে। তাহার সুন্দর চিবুকের উপর এক কালো তিল ছিল যাহা ভ্রমরকেও রূপে পরাজিত করে। কিন্তু তৃণের মাথায় চন্দন দিয়া সেই কালো তিল ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশের মেঘের রঙ তোমার রঙের মতন বলিয়া চন্দ্রাতপ খাটাইল, যাহাতে মেঘের দিকে দৃষ্টি না পড়ে। কোন কালো রঙের সখীকে কাছে যাইতে দেয় না। তমাল গাছগুলি চুন দিয়া সাদা করিল; কোকিল ও ময়ূরগুলি দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। একটি পণ্ডিত টিয়াপাখী তোমার গুণগান করিত, তাহার উপর রাগ করিয়া তাহার খাঁচা আছড়াইয়া ফেলিতে যাইতেছিল। আমি দৌড়াইয়া যাইয়া ধরিলাম। কালো রূপ দেখিবে না বলিয়া রাধা ভ্রমরের ভয়ে চম্পকতরুর তলায় পলায়ন করে—অথচ ভ্রমর তাহার পিছে পিছে ধাওয়া করে, সেইজন্য তাহার চোখে জল আসে।

নিজের কালো চুল দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া দর্পণ আছড়াইয়া টুকরা টুকরা করিল। তাহার মানের চেয়ে এখন ক্রোধই বেশী হইয়াছে। তাই তুমি নিজে যাইয়া চেষ্টা কর, তাহাকে শান্ত করিতে পার কি না।

১৬৩. প্রেম-আগুনি মনহিঁ গুনি গুনি
এ দিন যামিনী জাগি রে।
মদন-পঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রস-কণ লাগি রে॥
কি ফল মানিনি মান মানসি
কানু জানসি তোরি রে।
তুহুঁ সে জলধর অঙ্গে শোহসি
তুলহ দামিনী গোরী রে॥
নওল-কিশলয়- বলয় মলয়জ-
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত রে।
শয়ন ছটফটি লুঠই ভূতলে
তো বিনু দহ দহ গাত রে॥
জানি পুন পুন ও পিয়া পরীখসি
পূজই পহুঁ পাঁচ-বাণ রে।
রায় চম্পতি এ রস গাহক
দাস গোবিন্দ গান রে॥ —ক্ষণদা. ৯।৩ ; তরু. ৫৬৮

তরু.র ভণিতা—

প্রাত আদিত ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

টীকা: প্রেমরূপ অগ্নির কথা মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কৃষ্ণের চোখে নিদ্রা নাই; তিনি দিনরাত্রি জাগিয়া আছেন। তিনি কুঞ্জে বসিয়া তোমার এক বিন্দু প্রেমের জন্য কাঁদিতেছেন—কুঞ্জ যেন মদনের কারাগার (পঞ্জর) স্বরূপ হইয়াছে, তাই তিনি সেখান হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না—সুখস্মৃতি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কানু তোমার ছাড়া আর কাহারও নয়, এ কথা জানিয়াও তুমি কেন মান করিয়া আছ? সেই জলধরশ্যামের অঙ্গে তুমি গৌরী, দুর্লভ বিদ্যুতের মতন শোভা পাও। কৃষ্ণ তোমার বিরহে নবকিশলয় ও পদ্মপত্র বিছাইয়া দেহে চন্দন লেপন করিতেছেন, তথাপি তাঁহার দেহ শীতল হইতেছে না, পুড়িয়া যাইতেছে। তুমি সব জানিয়া বুঝিয়াও সেই প্রিয়তমকে কেন বারংবার পরীক্ষা কর? গোবিন্দদাস গান করিয়া বলিতেছেন যে, রায় চম্পতি

এই রসের গ্রাহক। গোবিন্দদাসের 'তু বিহু সুখময় শেজ তেজল' ইত্যাদি পদের ভণিতাতেও রায় চম্পতির উল্লেখ আছে—

রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

রায় চম্পতি শ্রীরাধার দুর্জয় মানের পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া গোবিন্দদাস এখানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। চম্পতি খুব সম্ভব গোবিন্দদাসের বন্ধু ছিলেন।

১৬৪. আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি ॥
আনন্দমন্দির তুমি, জ্ঞানশকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি ॥
সঙ্গে সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম ॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥ —তরু. ২৯৫৫

এই পদটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার কয়েকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্তি, আমার মূর্তিমতী কামনা—অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়; না, তুমি তাহারও অধিক—তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই—না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্বশরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ; রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারও অধিক, তুমি প্রাণেরও গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে। ঐ যে বলা হইয়াছে "মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি," ইহাতে হাসির মাধুর্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশীর ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্মমৃণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর, অতি মৃদু একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে

লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।'
—রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ, পৃ ১১০৬-৭)।

১৬৫. রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দসিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল-করে মোছই লোর॥
মান জনিত দুখ সব দূর গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস॥ —তরু. ৭৬১

চতুর্দশ স্তবক

কলহান্তরিতা

১৬৬. কনক চম্পক গোরাচান্দে।
ভূমেতে পড়িয়া কেন কান্দে॥
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
কে করিল আমারে বাউরি॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
কহে ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত ঘোটনা করে কেনে॥
কোন ভাবে কহে গোরারায়।
নরহরি সাধিয়া বেড়ায়॥ —তরু. ৮০৯

১৬৭. আকুল প্রেম পহিলে নাহি জানলো[১]
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥

সজনি, তোহে কহোঁ[২] মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনী রোখই
সো তাপিনী জগ মাহ ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলো
কাহ্নুক পীরিতি[৩] উপেখি।
সো মনসিজশরে তনু মন জারল[৪]
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন ভেল[৫] সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস কহ[৬] সতি ভামিনি
ঐছন কাহ্নুক লেহ ॥

—রসকলিকা পৃ ৩৭-৩৮ ; পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৮৩ ; তরু. ৪৩৩

টীকা : আন্ধল—অন্ধ হইয়া। প্রেমে অন্ধ হইয়া আমি প্রথমে জানিতে পারি নাই যে, কৃষ্ণ শুধু একার আমার নহে, তিনি বহুবল্লভ। আদর বাড়িবে আশা করিয়া তাঁহার সহিত কলহ করিয়া এখন আমার দিবারাত্র প্রাণ জ্বলিতেছে। সখি! তোমাকে আমার অন্তরের দাহের কথা বলি। কানাইয়ের দোষ দেখিয়া যে সুন্দরী রাগ করে, সে পৃথিবীর মধ্যে সত্যই সন্তপ্তা। আমি কানাইয়ের প্রেম উপেক্ষা করিয়া নিজের মানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম, আর এখন কামদেবের শরে দেহ মন জ্বলিয়া গেল ; কেন না, তাঁহাকে এখন দেখিতে পাইতেছি না। আমার মান তো দূরে গিয়াছেই সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য ও লজ্জাও গিয়াছে। ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না বলিয়াই তোমাকে সব বলিতেছি। এখন আমার জীবনও থাকে কি না সন্দেহ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সত্যই সুন্দরি, কানাইয়ের প্রেমের স্বরূপই ঐ।

পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে পাঠান্তর : ১. হেরলুঁ ২. কহি—তরু. ৩. মিনতি ৪. ভেল জরজর ৫. রহত ৬. কহই।

১৬৮. কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢায়ই
প্রেম করই জনি মান ॥
সজনি, অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ।
মান দগধ জিউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোখ ॥

যো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনে তনু জর জর
পরশ পরশ সম ভেল॥
সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপলুঁ কান।
গোবিন্দ দাস সরস বচনামৃত
পুন বাহুড়ায়ব কান॥—পদা.সমুদ্র পৃ ১৮৬ ; তরু. ৪৩৪

টীকা : কোন কুলবতী রমণী যেন কোন পরপুরুষকে নয়নে না দেখে ; যদি দেখেই, তাহা হইলেও কৃষ্ণকে যেন না দেখে। আর কৃষ্ণকেই দেখিয়া ফেলিলেও, তাহার সহিত যেন প্রেম না করে। আর প্রেম যদি করেও, তাহাতে আবার মান যেন না করে। সখি! অতএব আমি নিজের দোষ মানিয়া লইতেছি। আমার মান-সন্তপ্ত প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। কৃষ্ণের প্রতি কি রাগ করা যায়? যে আমার চরণের স্পর্শ লাভ করিবার জন্য আমাকে লক্ষ মিনতি জানাইল, তাহার দেখা না পাইয়া এখন আমার দেহ জরজর হইল। এখন তাহার স্পর্শলাভ স্পর্শমণির স্পর্শের মতন দুর্লভ হইল দেখিতেছি। সখী আমাকে কত বুঝাইল, সে কথা কানে তুলিলাম না। গোবিন্দদাস সরস বচনামৃত বলিতেছেন—কানাই তোমার আবার ফিরিয়া আসিবে।

১৬৯. শুনইতে কানু- মুরলি-রব মাধুরি
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি
জিবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম জলদ রস আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সীচহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥ —পদা. সমুদ্র ১৮৬ ; তরু. ৪৩৫

টীকা : সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—তুমি প্রথম যখন মুরলীর মধুর ধ্বনি শুনিলে, তখনি তোমার কান হাত দিয়া ঢাকিয়া দিয়া তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। তার পর যখন তুমি কানাইয়ের রূপ দেখিলে, তখনও তোমার চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি মুগ্ধা হইয়া আমাকে বাধা দিলে। সুন্দরি ! সেই সময়ই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, ভ্রমেও তাহার সঙ্গে যদি প্রেম কর, তাহা হইলে সারা জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে। তাহার গুণ পরীক্ষা না করিয়া কেবল রূপের লালসায় নিজের দেহ সমর্পণ করিলে, এখন প্রতিদিন এই রূপলাবণ্য তোমার ক্ষীণ হইতেছে, প্রাণেও বাঁচ কি না সন্দেহ। তুমি হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে শ্যামরূপ মেঘ উহাকে জল দিয়া বর্ধিত করিবে, সেই তরুকে এখন চোখের জল দিয়া সিঞ্চন কর—এই কথা গোবিন্দদাস বলেন।

১৭০. চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ।
সো নহি পহিরলুঁ দূরহি ডারলুঁ
মানিনি অবনত মাথ ॥
সজনি, কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল ॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমি চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি ॥
সো বহু-বল্লভ সহজই দুর্লভ
দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহিঁ মনোরথ পুর ॥ —তরু. ৪৩৬

টীকা : শ্রীকৃষ্ণ অতি যত্নের সহিত নিজের হাতে মালা গাঁথিয়া আমার পায়ে পড়িয়া তাহা পরাইবার জন্য সাধিলেন, আমি তাহা পরিলাম না, দূর করিয়া ফেলিয়া দিলাম, তখন মানিনী হইয়া মাথা নিচু করিয়া ছিলাম। সখি ! আমার এমন দুর্বুদ্ধি কেন হইল ? আমার পোড়া মানের ফলে বিদগ্ধ (রসিক, অন্য অর্থে তিনিও বিশেষরূপে দগ্ধ হইলেন) মাধব রাগ করিয়া আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। আমার নাথ, যিনি গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি আমার বাহু ধরিয়া কত সাধিলেন, আমি একবার ফিরিয়া তাকাইলাম না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম,

এখন কি করি বল। সেই কৃষ্ণ বহুবল্লভ, সুতরাং সহজেই তিনি দুর্লভ; তাঁহার দেখা পাইবার জন্য আমার মন কাঁদিতেছে। গোবিন্দদাস যখন যত্ন করিয়া উভয়ের মিলন ঘটাইবেন, তখনই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

এই পদটিতে শ্রীরূপের নিম্নলিখিত পদটির প্রভাব দেখা যায়—

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশম্।
মাধবচাটুপটলমপি লেশম্॥
নালোকয়মর্পিতমুরু হারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্॥
হন্ত সনাতনগুণমভিযান্তম্।
কিম্‌ধারয়মহমুরসি ন কান্তম্॥

হে সখি! আমার অধীর হৃদয় অবসন্ন হইতেছে। আমি গোকুলবীরকে ভজিলাম না; মাধবের প্রণয়পূর্ণ চাটুবাক্যেও কর্ণপাত করিলাম না। দয়িত আমার গলে বিশাল হার পরাইলেন, বার বার প্রণাম করিলেন, আমি কিন্তু একবার ফিরিয়াও দেখিলাম না! হায় হায়! সনাতন প্রাণকান্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলেন, কেন আমি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম না।

১৭১. তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি, সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোককি কূপে
মুরছিত জনে ঘা- তন নহে সমুচিত
জগজন কহব বিরূপে
ভাঙ্গল মান সবহুঁ জনগঞ্জন
পিরিতি পিরিতি করি বাধা
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥

সো মুখ-চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দি-বিষ-হ্রদ-নীরে।
পামরি গোবিন্দ- দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে॥ —তরু. ৪৪০

১৭২. কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহ।
ঐছন বচন কানু যব শূনব
জিবনে না বান্ধব থেহ॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥
কানুক চীত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত পথ চাই॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাসক শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥ —তরু. ৪৪১

টীকা: জিবনে না বান্ধব থেহ—জীবনে আর স্থৈর্য অবলম্বন করিতে পারিবে না। তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি…ইত্যাদি—তুমি যদি তাহাকে লাখ গালিও দাও, তাহা হইলেও সে তোমার পথপানে চাহিয়া থাকে। পরমাদসি—প্রমাদ ঘটাইতেছে।

১৭৩. রাইক বিনয়- বচন শুনি সো সখি
চললহি শ্যামক আগে।
দূরহি তাক বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমকি রীত।
আদর বিনহিঁ সোই বহু-বল্লভ
দোতি নিয়ড়ে উপনীত॥
দোতি কহত তুহুঁ কৈছন পীরিতি
রীত বুঝই নাহি পারি।

সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছাড়ি ॥
আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপ চলহ মঝু সাথ ॥ —তরু. ৪৪৪

টীকা: রাইয়ের অনুনয় শুনিয়া সেই সখী শ্যামের নিকট চলিল। মাধব দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই নিজের প্রেম নিবেদন সার্থক হইয়াছে জানিলেন। প্রেমের রীতি কি অদ্ভুত! যিনি বহুবল্লভ, তিনিও বিনা আদরে দূতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। দূতী বলিলেন—তোমাদের দুই জনের যে কেমন প্রেম, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যদি মান করিয়া তোমার প্রতি রোষ প্রকাশ করিল, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া আসিলে কেন? নিজের দোষ যদি মনে মনে বুঝিয়া থাক, তো আর কথা বাড়াও কেন? তুমি আমার সঙ্গে চল, গোবিন্দদাস নিজে তোমার জন্য রাধাকে সাধিবেন।

১৭৪. শুন শুন সজনি! কি কহব তোয়।
দরশন বিনু তনু ধরণ না হোয় ॥
ধীরজ লাজ সবহুঁ গেও মিট।
হিয় মাহা বেধত মনমথ-কীট ॥
তনু মন জীবন তাকর সাথ।
এত কহি মাথে ধয়ল সখীহাত ॥
তুহুঁ বিনু কোই নাহি ইথে মোর।
বুঝি লেয়লু হাম শরণহি তোর ॥
কহ কবি শেখর ধীরজ রহ শ্যাম।
কহি চলি আয়ল রাইক ঠাম ॥ —গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৭২

১৭৫. রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণি লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহুঁ বিমুখি ভেল রাই ॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥

তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহিঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলল তব কান॥ —তরু. ৪৩০

টীকা: শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ অনুনয় করিয়া রাধার দুই চরণ ধরিলেও, রাধা তাঁহার মুখ দেখিলেন না। তাহাতে গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, মিথ্যাই তিনি কানুকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তাঁহার হইয়া সাধিবেন। কানাই কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

১৭৬. কানু উপেখি, রাই মহি লেখই, মানিনি অবনত মাথ।
নিরুপম নারিবেশ করি সো হরি, আয়ল সহচরি সাথ॥
শুন সজনি, কি ফল মানিনি মানে।
ঢীট কানাই, কতহু ভঙ্গি জানত, কো করু কত অবধানে॥
শামরি হেরি, রাই সখি পুছত, সো কহু ব্রজনবরামা।
তুয়া সখি হোত, যতনে চলি আয়লি, কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
করতহি কোর, পরশ সঞে জানল, কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত, হেরত গোবিন্দদাস॥
—পদা.সমুদ্র পৃ ২০০

টীকা: কানুকে উপেক্ষা করিয়া রাই মানিনীরূপে অবনত মাথায় মাটিতে লিখিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ অতুলনীয় নারীবেশ ধারণ করিয়া সখীর সহিত আসিলেন। সখী বলিলেন—শুন রাধে! আর মান করিয়া কি ফল। ধৃষ্ট কানাই কত ভঙ্গিই জানে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? এ দিকে রাধা শ্যামাকে দেখিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই নূতন ব্রজরামাটি কে? সখী উত্তর দিলেন—এ তোমার সখী হইবে বলিয়া যত্ন করিয়া আসিয়াছে, এই শ্যামাকে আলিঙ্গন দাও। আলিঙ্গন করিতেই স্পর্শ হইতে রাধা বুঝিলেন, এই কৃষ্ণের কপট বেশ। ইহা বুঝিয়া রাধা এমন জোরে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার ঠোঁট যেন নাসা স্পর্শ করিল, তাঁহার চোখও কুঞ্চিত হইল—ইহা গোবিন্দদাস দেখিতে পাইলেন।

১৭৭. তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা।
কবলয় চান্দ মিলন একু ঠামা॥

শ্যামর নাগর নাগরী গোরী।
নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোরি॥
নিবিড় আলিঙ্গনে পিরীতি রসাল।
কনকলতা যৈছে বেঢ়ল তমাল॥
রাই-পয়োধরে প্রিয়কর সাজ।
কুবলয়ে শম্ভু পূজল কামরাজ॥
রায় শেখর কহে নয়ন উল্লাস।
নব ঘন থির বিজুরী পরকাশ॥ —ক্ষণদা. ১৭।১২

পঞ্চদশ স্তবক

দান

চুঙ্গি বা octroi কর গ্রহণ করার রীতি মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল—এখনও কোন কোন শহরে জিনিসপত্র বেচিবার জন্য আনিলে তাহার উপর কর আদায় করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ দানী অর্থাৎ এই কর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী সাজিয়া গোপীদের নিকট হইতে কর চাহিতেছেন—এই লীলা লইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর 'দানলীলাকৌমুদী' ও রঘুনাথ গোস্বামীর 'দানকেলিচিন্তামণি' রচিত হইয়াছে। দানলীলা সম্বন্ধে প্রাচীন কোষগ্রন্থে, অলঙ্কারশাস্ত্রে বা পুরাণে কিছু পাওয়া যায় না।

১৭৮. আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥
—ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯৩৫ ; তরু. ১৩৬৮

১৭৯. কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরায় বিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে॥

পথে যাইতে কহে কথা কানুপরসঙ্গ।
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চল হরিণী যেন দীগ নেহারে॥
হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে॥
উহার উপরে শোভে নব ইন্দ্রধনু।
বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু॥
মথুরায় বিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বস্যাছে কানাই॥
বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী॥ —তরু. ১৩৬৯

টীকা: তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে···ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নবীন মেঘের মতন, আর তাঁহার পীত বসন যেন বিদ্যুতের মত। তাঁহার মাথায় ময়ূরের চূড়া দেখিয়া মনে হয়, যেন শ্যাম মেঘের উপর ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে।

১৮০. কহ লহু লহু জটিলার বহু
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ
এত না গরব কেনে॥
পসরা লইয়া যাইছ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজকাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পরিচয়॥
এ রূপ যৌবনে নানা আভরণে
যাইছ মথুরা বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কাকে॥
অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে॥
এত কহি হরি দু বাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।

জ্ঞানদাসে কয় কিবা কর ভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া ॥ —তরু. ১৩৭৮

টীকা : এথা কিবা পরিচয়—এখানে পরিচয়ের কথা তুলিয়া লাভ নাই; আমি রাজকাজ করি, পরিচিতের নিকটও কর লইতে আমি বাধ্য। ইথে কি আমার লাজে—আমাকে লজ্জা করিয়া কি করিবে? আমাকে বরং কর্তব্যপালনে সাহায্য কর, বুকের ভিতর কি লুকাইয়া রাখিয়াছ, খুলিয়া দেখাও।

১৮১. দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখল তাই ॥
কহে কিয়ে পসার বিথার দেখি এথা।
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা ॥
যত আভরণ গায় বেশভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে ॥
নিতি নিতি গতাগতি করি এই ঠাঞি।
এ পথে মদনরাজ কভু শুন নাই ॥
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ অনুগত জনে হেরি পুন হাস ॥
কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহু নাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা ॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল।
পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল ॥ —তরু. ১৩৮৭

১৮২. না যাইও না যাইও রাই বৈস তরুমূলে।
আসিতে পায়্যাছ বেথা চরণ যুগলে ॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে ॥
নীল উড়নির মাঝে মুখ শোভা করে।
সোনার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥
করিকুম্ভদন্ত জিনি কুচকুম্ভ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিঁধিবেক ব্যাধ হেম হরিণির লোভে ॥

সিন্দূরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশি বলি মুখ রাহু গরাসয়॥
নলিনী দলন রাই তব মুখ করে।
ভ্রমর ছাড়িবে কেনে রস নাহি পিলে॥
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জনি পড়ে॥
বংশীবদন কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥ —তরু. ১৩৬০

টীকা : শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নানা রকমের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। প্রথমতঃ, রাধার মণিমুক্তা দেখিয়া চোর-ডাকাতে সব লুঠ করিয়া লইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বেণী ঠিক সাপের মতন দেখাইতেছে; ময়ূর সর্পভ্রমে উহা গিলিয়া খাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, তাঁহার মুখকে কমল মনে করিয়া ভ্রমরে দংশন করিতে পারে। চতুর্থতঃ, করিকুম্ভের চেয়েও সুন্দর তাঁহার কুচকুম্ভ দেখিয়া সিংহ আক্রমণ করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, রাধার হরিণ-নয়ন দেখিয়া ব্যাধ হরিণীভ্রমে শরসন্ধান করিতে পারে। ষষ্ঠতঃ, তাঁহার মুখ চন্দ্রের মতন আর কপালের সিন্দূরের বিন্দু সূর্যের মতন, তাই রাহু এই রবি-শশীকে গিলিতে পারে। এই সব কারণে রাধার উচিত তরুতলে বসা।

১৮৩. আজি নহে কালি নহে জানি বাপ পিতামহে
গোকুল নগরে নহে ঘাটী।
ঘৃত নবনীত দধি বেচি নিয়া নিরবধি
আজি তুমি কর মিছা হঠি॥
নিলাজ কানু পথ ছাড়, না কর বিরোধে।
বুঝিল তোমায় তিলেক নাহি বোধে॥
পাটে কংস নরবর অতি বড় খরতর
তারেও তোমার নাহি ডর।
... ...
কি তোরে করিব ক্রোধ যশোদার অনুরোধ
সহিল সকল কুবচন।
যদি বল আর বার উচিত পাইবে তার
মাধবের স্বরূপ বচন॥—মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পৃ ৭২

হেন রূপে কেনে যাও মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবা বিপাকে

দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রমজল বিন্দু যেন মুকুতার দাম॥
বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর॥ —তরু. ১৩৫৯

১৮৫. রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান।
কিবা চায় কিবা লয় কেবা করে আন॥
কুলনারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা।
সঙ্গে বুড়ী হাতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথা॥
এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজি॥
কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল।
তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল॥
অতয়ে আমার বোলে হও সাবধান।
কুলবতী দেখি আর না করিও আন॥
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা।
এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা॥ —তরু. ১৩৮৮

১৮৬. হেদে হে নিলজ কানাই
না কর এতেক চাতুরালী।
যে না জানে মানসতা তার আগে কহ কথা
মোর আগে বেকত সকলি॥
বেড়াইলা গরু লইয়া সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া
এবে হৈলা দানী মহাশয়।
কদম্ব তলায় থানা রাজপথ কর মানা
দিনে দিনে বাড়িল বিষয়॥
আন্ধার বরণ কাল গা ভূমেতে না পড়ে পা
কুল-বধূ সনে পরিহাস।
এ রূপ নিরখিয়া আপনাকে চাও দেখি
আই আই লাজ নাহি বাস॥
মা তোমার যশোদা তার মুখে নাহি রা
নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি।

জনমিয়া তার বংশে কাজ কর জিনি কংসে
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি ॥
একই নগরে ঘর দেখাশুনা আটপর
তিল আধ নাহি আঁখিলাজ।
রায় শেখরে কয় রাজারে না করে ভয়
এ দেশে বসতি কিবা কাজ ॥ —তরু. ১৩৭৭

১৮৭. সহজই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এত রঙ্গ ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস ॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পরনারী দেখিয়া না কাঁপ ॥
না জানি মরমে কিবা ভাবো।
তেঞি সে বাতাসে রসে ডুবো॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম ॥ —তরু. ১৪০০

টীকা: থুইতা—রাখিতে। সঘনে আঁখি চাপ—কটাক্ষ কর। বাতাসে রসে ডুবো—আমাদের নিকট হইতে কোন ইঙ্গিত না পাইয়াও নিজের মনেই রসে ডুবিতেছ।

১৮৮. এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
না জানি কিসের রঙ্গ ॥
গিরি গিয়া যদি আরাধনা কর
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে শরণ শৈলজা
পূজা কর এক ভাবে ॥
জলধি জাহ্নবী- সঙ্গম নিকটে
সঙ্কটে কামনা কর।

তবু বৃষভানু- নন্দিনী বিভোল
অঞ্চল ছুঁইতে যায় ॥
অলপে অলপে সঘনে সঘনে
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ থাকিতে হিয়ায়
হাথে বাড়াইছ দিঠ ॥
মদনে আকুল আপন দুকুল
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত নহিলে
কি লাগি বাহু পসার ॥ —লহরী. পৃ ২৭৩

পদামৃতসমুদ্রে ও তরু.তে (১৩৪১) এই পদের সহিত অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত একটি পদ গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। প্রথম দুই চরণের সঙ্গে ঐ পদের অনেক মিল আছে; কিন্তু তাহার পর—

এমন আচর নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।… ইত্যাদি আছে।

১৮৯. বান্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জামালা তাহে বল সোনা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা ॥
অহে কানাই, বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা।
আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহি যে আমরা ॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান কংস দরবার জান
দেখি কেনে নহ একপাশ ॥
চতুর চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাচে কর কাঞ্চন সমান।
শুনি জ্ঞানদাস কহ হিয়ায় কষিয়া লহ
কাচ নহে কষটি পাষাণ ॥ —তরু. ১৩৮৯

টীকা: বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা—বিষয় সম্পত্তি পাইয়া মদমত্ত হইয়াছ। আন হেন নহিক আমরা—আমরা অন্য মেয়েদের মতন সহজলভ্য নহি।

১৯০. আহির রমণী যত চলাঞা বাহির পথ
আপনি আস্তাছ আন ছলে।
বাহু নাড়া দিঞা যাও দানী পানে নাহি চাও
এত না গরব কর কারে॥
গলে গজমোতি হার এক লক্ষ দাম তার
দুই লক্ষ সিথার সিন্দুর।
তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীতবাস
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর॥
হেদে লো কিশোরি গোরি নিতি যাও মধুপুরি
দান দেহ যে হয় উচিত।
শুন বৃষভানু-ঝি আঁচলে ঝাপিলে কি
দেখাইঞা কর পরতীত॥
কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কাহ্নু
অন্য হইলে আমি ভাল জানি।
যদি বল আন বোল মাথায় ঢালিব ঘোল
হাসিলা অনন্তপহুঁ শুনি॥
—পদামৃতসমুদ্র পৃ ২৫৮; সংকীর্তনামৃত ২৫১

রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'মাথায় ঢালিব ঘোল' পাঠ কোথাও দেখা যায় বটে, কিন্তু 'স তু নাতিরসদঃ'। তিনি পাঠ ধরিয়াছেন, 'যদি পুন এমন বল, তবে পাবে প্রতিফল'। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ঘোল ঢালার প্রস্তাব ঠাকুর মহাশয়ের ভাল লাগে নাই।

পদটি নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকের ভাবানুবাদ—

ক যাসি দানীত্যপি নৈব পশ্যতি দৃগঞ্চলেনাপি গজেন্দ্রগামিনি।
কিমঞ্চলেনাপিহিতং কিশোরি মে তদাকলয্যাশু করঃ প্রদীয়তাম্॥

১৯১. রাধা মাধব নীপমূলে হো।
কেলি-কলারস দান ছলে হো॥
দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপমূলে লুঠই রাই॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখিগণ হেরি দুহে বাঢ়ল উল্লাস॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি দুহার নয়ানে নয়ান
কমলে মধুপ যেন হইল মিলন॥

দোঁহার অধরমধু দুহুঁ করু পান।
নিজ অঙ্গ দিল রাই ঘন রস দান॥
মীলল দুহুঁজন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস॥ —তরু. ১৩৬৭

ষোড়শ স্তবক

নৌকাবিলাস

১৯২. না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী-তীরে গেলা সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গে তা৷করিয়া।
নৌকায় চড়িলা গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥
আপনে কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সভে পাণি॥
পারিষদগণ সবে হরি হরি বোলে।
পুরব সোঙরি কেহো ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধর-মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে॥ —তরু. ১৪০৯

১৯৩. গুরুজন বচনহি গোপ যুবতীগণ
লেই ষজ্ঞঘৃত থোর॥
রাইক সঙ্গে চলু নব নাগরী
পন্থহি ভাবে বিভোর॥
কৈছনে হেরব নাগর-শেখর
কৈছে মনোরথ পূর।
ঐছন গোবর্ধন বনে আয়ল
জানল নাগর শূর॥
মানস সুরধুনী দু কূল পাথার হেরি
কৈছে হোয়ব ইহ পার।
প্রাবৃট সময়ে গগনে ঘন গরজই
খরতর পবন সঞ্চার॥
দূরহি নেহারত শ্যাম সুধাকর
তরণী লেই মিলু ঠাম

হেরি উলসিত মতি সবহু কলাবলী
জ্ঞান কহে পূরল কাম ॥ —মাধুরী. ৩।৩৮০

১৭৪. বড়াই, হোর দেখ রূপ চেয়ে।
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ বরণ নেয়ে ॥
ঐ কি ঘাটের নেয়ে ?
রজত কাঞ্চনে নাথানি সাজান
বাজত কিঙ্কিণীজাল।
চাপিয়াছে তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি-বাঁধা কেরোয়াল ॥
রজতের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব-মঞ্জরী কানে।
জঠর পাটেতে বাঁশীটি গুজেছে
শোভে নানা আভরণে ॥
হাসিয়া হাসিয়া গীত আলাপিয়া
ঘুরাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় না জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি ॥
আমরা কহিও কংসের যোগানি
ছুকে না হেলিও কেহু।
জ্ঞানদাস কয় শশী ষোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু ॥ —মাধুরী ৩।৩৮১

১৭৫. ওহে নবীন নেয়ে হে, তরণী আনহ ঝাট ঘাটে।
আমরা হইব পার বেতন দেয়ব সার
ঘর যাওয়ার বেলা টুটে ॥
গোপিনী পঞ্চম স্বরে ডাক দেই ধীবরে
বলে নৌকা আন ঝাট ঘাটে।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে করিছে বেগ
নৌকাখানি আন ঝাট ঘাটে ॥
ওহে, তোমরা কে হে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে।
সুন্দর বদনি ধনি পঞ্চম স্তাবণি
নবীন-যৌবনী তোমরা কে হে ॥

তোমরা ডাকিছ সুখে তরণি পড়েছে পাকে
আপনা সামালি তবে যাই হে।
ওহে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে॥
নাবিক রতন মণি তরণী নিকটে আনি
চড় সভে পার করি আমি হে।
শুনি সুবদনী ধনি হরিষে তরল তনি
তরণিতে চড়ি সখি মেলি হে॥
নৌতুন নাবিক কান নাহি জানে সন্ধান
বেগে বাহি লেয়ল তরণী।
টুটি তরণি হেরি কাঁপে সব সুকুমারি
জ্ঞানদাস সিঞ্চয়ে পানি॥ —মাধুরী. ৩।৩৮২

১৯৩ মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দু কূলে বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নাহি কেউ॥
দেখ সখি, নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িলুঁ কেন নায়?
নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জালা সহিবে কে
কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হইল
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি থির হইয়া থাক দেখি
এখন না ভাবিহ বিষাদ॥ —তরু. ১৪১১

১৯৭: ভুবন-মোহন শ্যামচন্দ্র।
ভানুসুতা পানে চায় হাসি হাসি কথা কয়
শুন শুন যুবতীর বৃন্দ॥
জলের ঘুরণি বড় তরণী আমার দড়
অশ্ব গজ কত নর নারী।

দেবতা গন্ধর্ব যত পার করি শত শত
যুবতী যৌবন ইথে ভারি ॥
উমড়িয়া শ্যাম মেঘে ফিরি দেখ চারি দিগে
পবনে কাঁপয়ে সব তনু।
ঘন উছলিছে জল নৌকা করে টলমল
তরুণী তরণী ভার দুহু ॥
আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর
বসন ভূষণ ভার ছাড়।
নাবিকের বেতন দাও সঘনে তরণী বাও
নহে সবে গোবিন্দ সওর ॥
শুনি সুবদনি কয় আগে পার করি দাও
পাছে দিব যে হয় উচিত।
জ্ঞানদাস কহে বাণি আগে দিলে ভালে জানি
পাছে হয় হিতে বিপরীত ॥ —মাধুরী. ৩।৩৮৫

১৯৮. চিক্কণ শ্যামল রূপ নব ঘন ঘটা।
তরুণী বহিয়া যায় কিবা অঙ্গের ছটা ॥
দু কূল করিয়া আলো নাবিকের রূপে।
জগজনমন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে ॥
গলে গুঞ্জা বনমালা শিরে শিখিপাখা।
দেখি মেনে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
ঠেকিলুঁ নেয়ের হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায় ॥
মুচকি হাসিয়া নেইয়া যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায় ॥
বংশীবদনে কহে থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হইলে না বাহিত নেইয়া ॥ —মাধুরী. ৩।৩৮৮

১৯৯. ঝমকি ঝমকি পড়িছে কেরোয়াল
ব্রজবধূ বায়ত রঙ্গে।
শ্রীহরি কাণ্ডারি ব্রজবধূ দাঁড়ি
সারি গায় তারা রঙ্গে ॥
সুন্দরী নাগরী বদন নেহারি
বারে বারে দেখে রঙ্গে।

যমুনা নেহারে আনন্দে উথলে
বহিছে উজান তরঙ্গে ॥
দু কূলের লোকে দেখে মনসুখে
আনন্দ সায়রে ভাসে।
কহে বংশীদাস মনের উল্লাস
রহি সখিগণ পাশে ॥ —মাধুরী. ৩।৪০

২০০. রাই কানু যমুনার মাঝে।
ফিরয়ে তরণী জলের ঘুরণী
দূরে গেল কূল লাজে ॥
কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই-কানু-রূপে ভুলি ॥
কহয়ে ললিতা হৈয়া সচকিতা
শুন লো মুখরা বুড়ি।
তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা নায়
পরাণ সহিতে মরি ॥
মুখরা কহয়ে যে মাগে কাণ্ডারী
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী পার হবে'খনি
কেন বা যাইবে প্রাণ ॥
এ সব বচন শুনিয়া কাণ্ডারী
কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখির পরশ মাগিয়ে
বংশী শুনিয়া হাসে ॥ —মাধুরী. ৩।৪০৪

২০১ না যাও হে না যাও হে নবীন কাণ্ডারী।
ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি ॥
ত্বরায় তরণী লইয়া তীরে আইলে শ্যাম।
সফল করিল বিধি পূরল মনকাম ॥
ক্ষীর সর মাখন সহচরী দেল।
নাবিক সো সব কিছু নাহি লেল ॥
রাইক আঁচর ছোড়ি নাহি যায়।
সব সখিগণ তবে করল উপায় ॥

মাঝিক কহয়ে দেহ বেতন মোয়।
তবে হাম ছোড়ব আঁচর তোয়॥
কহি কহি চুম্বই রাই-বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান॥
পূরল মনোরথ আনন্দ ওর।
বৃষভানু-কুমারী নন্দকিশোর॥
নিজ নিজ মন্দির সত্তে চলি গেল।
বংশীবদন চিত্তে আনন্দ ভেল॥ —মাধুরী. ৩।৪০৮

সপ্তদশ স্তবক

রাসলীলা

২০২. বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ॥ —তরু. ১২৫৩

২০৩. শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরনি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলি গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত্ত-চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।

বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি ॥
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি ॥
ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস বোলনি ॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ২২১ ; তরু. ১২৫৫

টীকা : প্রেম রোপি—প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া। আপন সোঁপি—আত্মসমর্পণ করিয়া। বিসরি গেহ—ঘর ভুলিয়া। এক নয়নে কাজর-রেহ ইত্যাদি—ভাগবতের ১০।২৯।৭-এর 'ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা'র ভাব লইয়া লেখা।

২০৬

বিপিনে মিলল গোপ-নারি
হেরি হসত মুরলিধারি
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু-গাহনি।
পুছত সবক গমনখেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি ॥
হেরি ঐছন রজনি ঘোর
তেজি তরুণি পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনি।
গলিত ললিত কবরিবন্ধ
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ
বেঢ়ল বিশিখ-বাহিনি ॥

কিয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুমপাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি।
এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাহে মনহি গোই
ইহহি আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গাহনি॥ —তরু. ১২৫৬

টীকা: শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধ্বনি করিয়া গোপীদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আসিলে তিনি ভাল মানুষ সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমাদের জন্য আমি কি করিতে পারি? ব্রজের সব কুশল তো? এই যে প্রশ্ন ও তাহার সঙ্গে গোপীদের মুখের পানে চাওয়া, ইহা যেন 'প্রেমসিন্ধু গাহনি'—গোপীদের প্রেমসিন্ধু কতটা গভীর, তাহা দেখিবাব জন্য যেন তাহাতে অবগাহন। এরূপ কুশলপ্রশ্ন শুনিয়া তোমাদের চাহনি অমন কুটিল হইল কেন? এরূপ ঘোর রজনীতে তোমরা তরুণীরা পতির শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ—তাহা হইলে ব্যাপার তো সহজ নহে। এমন বেশবাসে বেসামাল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছ! ঘরে কি ঝগড়া হইয়াছে, না তীরন্দাজের দল (দস্যুর দল, মুদ্রিত তরু.র পাঠ 'বিপথবাহিনী' তাহার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না; প্রাচীন পুথিসমূহে 'বিশিখ-বাহিনী' পাঠ আছে) ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে? অথবা তোমরা এই শরৎ চন্দ্রে উজ্জ্বল রাত্রির শোভা দেখিতে আসিয়াছ? এত প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতেছ না—'রাখত কাহে মনহি গোই', মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতেছ কেন? 'ইহহি আন নহই কোই'—বলই না গো, এখানে তো অন্য লোক কেউ নাই, সবই আমরা আপন লোক, বলিয়াই ফেল।

২০৫. ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান॥
টূটল সবহুঁ মনোরথ-করণি।
অবনত-আনন নখে লিখু ধরণি॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিশিখ নহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর-চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ।
ভাঙ্গলি কুল-শিল মুরলিক নাদে।
কিঙ্করিগণ জনু কেশ ধরি আনে॥

অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্মিক হয়য়ে কুমারি-নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জিউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব
এতহুঁ কহল ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥ —তরু. ১২৫৭

২০৬. আরে দেখ শ্যামচন্দ্র ইন্দুবদন রাধিকে।
বিবিধ ছন্দ যুবতীবৃন্দ গাওয়ে রাগমালিকে॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন কুসুমগন্ধমাধুরী।
মদনরাজ রভসমাঝ ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী॥
তরল তাল গতি দুলাল নাচে নটিনী নটন স্থর।
প্রাণনাথ করত হাত রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশ ভোর কেহু রহত কানু কোর।
জ্ঞানদাস কহত রাগ যৈছন জলদে বিজুরি॥ —কীর্তনানন্দ ৪১৯

২০৭. যারে না দেখিলে রহিতে নারি।
ছাড়্যা গেল বংশীধারী॥
শুন হে কদম্ব তরু।
দেখিলে মদন-গুরু॥
সারি সারি আছ পথে।
দেখিঞাছ গোবিন্দ যাইতে॥
মল্লিকা মালতী যূথী।
গোবিন্দ দেখ্যাছ কতি॥
শুন তরু দয়া কর কহি তুয়া ঠাঞি।
এ পথে দেখ্যাছ যাইতে হলধরের ভাই॥
পীতাম্বর মনোহর নারী-মনোচোরা।
এহি পথে তারে যাইতে দেখ্যাছ তোমরা॥
শঠ বড় কথা দড় কত ভঙ্গি জানে।
নারীগণে ঘোর বনে চুলে ধরি আনে॥
মুখে হাসি হাতে বাঁশী কঠিন অন্তরে।
নারী বধে কিছু তাথে ভয় নাহি করে॥—কৃষ্ণদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পৃ ১৯৯

২০৮. যত নারীকুল বিরহে আকুল
ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর
দাঁড়াইল যমুনা ধারে॥
কদম্বের তলে বসি কোন ছলে
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে ব্রজ-বধূগণে
তাহাই মিলল আসি॥
মরণ শরীরে পরাণ পাইল
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে পুড়িয়া যেমন
অমিয়া-সায়রে কেলি॥
চাতকিনীগণ হেরি নব ঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর বদন সুন্দর
চকোরিণী চারি পাশে॥
বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত
বরিখে অমিযা রাশি।
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের বদনে
আধ ঈষত হাসি॥ —তরু. ১২৬৫

২০৯. নাগর নাচত নাগরি সঙ্গ।
বিবিধ যন্ত্র কত শবদ-তরঙ্গ॥
দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি বাজে মৃদঙ্গ।
ডম্ফ রবাব বিণ মুরলি উপাঙ্গ॥
বলয় নূপুর মণি-কিঙ্কিণি কলনে।
ঘুঙ্ঘুরু রুণু ঝুনু বাজত চরণে॥
আনন্দে অঙ্গ অঙ্গ অবলম্ব।
রসভরে গিরত মিলত পরিরম্ভ॥
কমলে মোতি কিয়ে মুখে শ্রমবারি।
রসিক কলাগুরু কহে বলিহারি॥
বিহসি বিলোকই দুহুঁ চিতচোরি।
রায় বসন্তপহুঁ রহুঁ হিয় জোরি॥ —তরু. ২৯২৯

টীকা: গিরত—পড়িয়া যাইতেছে। মিলত পরিরম্ভ—আলিঙ্গনে মিলিত

হইতেছে। কমলে মোতি কিয়ে—শ্রমবারি বা ঘর্ম বদনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, যেন মুখকমলে কেহ মোতি বসাইয়া দিয়াছে।

২১০. কঙ্কণ-কিঙ্কিণী নূপুরের ঝনঝনি।
অঙ্গ-আভরণ শব্দে পূরিল মেদিনী॥
অতুল শবদ হৈল এ রাস-মণ্ডলে।
রমণীর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোভে ভালে॥
হেন মণি মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
বিনি সুতে হার যেন বিচিত্র গাঁথুনি॥
দুই দুই গোপী মাঝে দেবকীনন্দন।
কত গোপী, কত কৃষ্ণ না যায় গণন॥
পদ আরোপণ, ভুজ যুগল কম্পিত।
কটাক্ষ বিলাস দৃগঞ্চল বিরচিত॥
ক্ষীণ কটিভঙ্গ, কুচ আলোলিত বাস।
গণ্ডযুগে তরলিত কুণ্ডল বিলাস।
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর যান।
ভাগবত আচার্যের মধুরস গান॥
—ভা. ১০।৩৩।৫-৭-এর অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

টীকা: ভণিতা অংশ—ধীরগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীল গদাধর যাঁহাদের, তাঁহাদের নিকট ভাগবত আচার্যের মধুরস গান।

২১১. কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি বৈদগধি-ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্রকরে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।

রাই কানু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গে ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে ।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই-মুখইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥
কুসুমিত বৃন্দাবন কলপতরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল ।
রতন রচিত হেম মঞ্জির শিঞ্জিত
নরোত্তম মনোরথ পুর ॥
—পদা. সমুদ্র পৃ ২৩১ ; তরু. ১০৭৪ ; কীর্তনানন্দ ৩০০

কীর্তনানন্দে শেষ দুই চরণের পাঠ—
হাসবিলাস রসকলা মধুর ভাষ লোচন
মোহন লীলা ধরু ।
দুহু রূপ লাবণি হেম মরকতমণি
নরোত্তম মনোরথ ভরু ॥

২১২. রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে
আলুয়্যা আলস-ভরে ।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে ॥
সখি হের দেখসিয়া বা ।
নিন্দ যায় ধনী চাঁদ-বদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা ॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসন ভূষা ।
নিশ্বাসে দুলিছে রতন-বেশর
হাসিখানি তাহে মিশা ॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে ।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভণে ॥ —পদা. সমুদ্র ২৩৬ ; তরু. ১০৮

এই চিত্রধর্মী মধুর পদটি কীর্তনানন্দে (২২৮) গোবিন্দদাস ভণিতায়, পদরস-সারে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ও পদকল্পতরুর 'ক' পুথিতে জ্ঞানদাস ভণিতায় দেখা

যায়। কিন্তু পদকল্পতরুর প্রাচীনতর পুথিগুলিতে ও পদামৃতসমুদ্রে ইহা জগন্নাথ দাস ভণিতায় ধৃত হওয়ায় আমরা এটি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য জগন্নাথ দাসের পদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

অষ্টাদশ স্তবক

কুঞ্জভঙ্গ

রাত্রির বিলাসের পর উষার পূর্বে রাধাকৃষ্ণকে জাগাইয়া স্বগৃহে প্রেরণই 'কুঞ্জভঙ্গ'।

২১৩. উঠ উঠ গোরাচান্দ নিশি পোহাইল।
নগরের লোক সব উঠিয়া বসিল॥
ময়ূর ময়ূরী রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা হায় যায় গোরামণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
করজোড় করি বোলে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিন্দ যায় গোরা প্রেমের আলসে॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৪০১

২১৪. কুসুমিত কুঞ্জ কুটির মনমোহন কুসুম সেজে দুহু নয়ল কিশোর।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গাবই বন বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল॥
বলি বলি জাগুয়ে ললিতা অলি।
শ্যাম গোরী মুখমণ্ডল ঝলকয় ছবি উঠত অতি ভালি॥
রজনীক শেষ জানি শ্যামসুন্দরী বৈঠলি সখিগণ সঙ্গ।
শ্যাম বয়ন ধনি করহি আগোরল কহইতে রজনীক রঙ্গ॥
হেরি ললিতা তব, মৃদু মৃদু হাসত পুলকে রহল তনু তোরি।
পীত বসনে ঝাপি মুখ সুন্দরী লাজে রহল মুখ মোড়ি॥
মুখহি মোড়ি রহল যব সুন্দরী কানু করত তব কোর।
আনন্দ মোচনে দাস নরোত্তম হেরত যুগল কিশোর॥
—পদামৃতসমুদ্র পৃ ২৩৭ (প্রথম দুই চরণ নাই); কীর্তনানন্দ ৪৩৮

২১৫. রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে॥

রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বোলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন শারি আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বংশীবদন বলে চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥ —তরু. ৬৫৮

২১৬. প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমন যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিমলোচন।
তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় শুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি॥ —তরু. ৬৫৭

টীকা: মোর প্রিয় সখা কৈয়—রাধা পুরুষের মতন করিয়া নিজেকে সাজাইতে বলিতেছেন; আর শ্রীকৃষ্ণকে শিখাইতেছেন যে, কেউ যদি গোকুলের পথে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে যেন তিনি বলেন, 'এ আমার এক প্রিয় সখা।' ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি—হরিণ যেমন বাঘের মধ্যে ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া বাস করে, তেমনি তুমি শাশুড়ী-ননদিনীরূপ বাঘদের মধ্যে বাস কর।

২১৭. প্রাতহিঁ জাগল রাধামাধব
মন্দির গমন বিধানে।
কয়হ বিদায় অবশেষ রজনি ভেল
অব পরণাম তুয়া চরণে॥
দুঃসহ বচন শ্রবণে কানু কাতর
জল পূরল দুয় নয়নে।

হিয় দগদগি কছু কহই না পারই
হেরি রহু রাইক বয়নে ॥
না তেজই কাছ পাছু অনুসারই
আগোরহি গহি বাহু বসনে।
পুন ধরি যতনে রাই সমুঝায়ই
কুল শীল গেল অভিমানে ॥
লাজ ডুবল হঠ না কর ঐছন
যৈছনে লোকে না জানে।
রায় বসন্ত কহ হঠ ছোড়ি গমন কর
না দেখহ ভৈ গেল বিহানে ॥ —তরু. ২৯০৫

২১৮. শুন মাধব কি কহিব আন।
আমার কে আছে আর তোমার সমান ॥
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদমুখ।
পরাণের সনে পুড়ি বড় পাই দুখ ॥
আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা।
বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় ক্ষেমা ॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে।
রায় বসন্তপহুঁ পরশিল ভালে ॥ —তরু. ২৯৫২

টীকা: পরশিল ভালে—কপালে হাত দিয়া কৃষ্ণ বুঝাইলেন যে, এই দুঃসহ বিচ্ছেদ কপালের লিখন।

২১৯. নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন
দুহুঁ দুহাঁ বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥
মাধব, হামারি বিদায় পায়ে তোয়।
তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আয়ব
অব দরশন নাহি মোয় ॥
কাতর নয়নে নেহারিতে দুহুঁ দুহাঁ
উথলল প্রেম তরঙ্গ।
মুরুছল রাই মুরুছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥

ললিতা সুমুখি সুমুখি করি ফুকরত
চরকত লোচন লোর।
কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ অবহু নহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরীত॥ —তরু. ৬৬০

ঊনবিংশ স্তবক

মাথুর বিরহ

২২০. কি করিলা গোরাচাঁদ নদিয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্তন-বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয়ে বুক॥
মুরারি মুকুন্দ না জিয়ব শ্রীনিবাস।
আচার্য অদ্বৈত ভেল জীবন নৈরাশ॥
নদিয়ার লোকসব কাতর হইয়া।
ছটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
একবার নদিয়া চল প্রভু গৌরহরি॥

২২১. গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনি পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কোই না রহু পহু পাশে॥
খেনে কান্দে তুলি দুই হাথ।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইলা বিভোরা॥ —তরু. ১৬৪৩

২২২. এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥ ধ্রু ॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ কতশত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যায়ত ছাতিয়া ॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভণয়ে শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া ॥ —পদরত্নাকর ৪০।৮১

মন্তব্য : পদটিতে বিদ্যাপতির ভণিতাও দেখা যায়। যথা তরু.তে (১৭৩৫)—
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

শব্দার্থ : ওর—সীমা ; ঘন—মেঘ ; গরজন্তি—গর্জন করে ; সন্ততি—সতত ; বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করে ; পাহুন—প্রবাসী ; ছাতিয়া—বুক।

২২৩. কে মোরে মিলায়া দিবে সো চান্দবয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ ॥
কাল রাতি না পোহায়, কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া ॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ, ছার নারী জাতি ॥
ধনজন যৌবন সোদর বন্ধু জন।
প্রিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন ॥
কেহো ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত্ত নিবারণ দিয়া ॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
সম্বাদ লেই চলু বলরাম দাস ॥
—পদামৃতসমুদ্র পৃ ২৯৭ ; তরু. ১৭৩৫

২২৪. পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়াগুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখ-সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ-পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥ —তরু. ১৬৪৭

২২৫. সোই জনক ব্রজ-রাজ।
না যায়ত ধেনু-সমাজ॥
বসিয়া রহয়ে নিশিদীন।
তিলে তিলে হোয়ত ক্ষীণ॥
কাহুক না কহ কছু বাত।
অবনত করি রহুঁ মাথ॥
ব্রজ-বালকগণ যাই।
কত পরবোধয়ে তাই॥
বহুত যতনে ব্রজনাথ।
ফুকরি কহয়ে কছু বাত॥
কহ কহ রে ব্রজবাল।
কাঁহা মঝু প্রাণ-গোপাল॥
সহচর ভিন কাহে ভেল।
লালন কাঁহা মঝু গেল॥
শুনি বালকগণ রোয়।
সো দুখ কি কহিব তোয়॥
শ্রীদামে করয়ে নিজ কোর।
সীচয়ে নয়নক লোর॥
তুয়া অভিলাষে অগেয়ান।
চুম্বয়ে তাক বয়ান॥
ঐছন বিরহ-হুতাশ।
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ —তরু. ১৭৫৭

২২৬. শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারি।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি ॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখি নও ইহা গেল জানা ॥
দাবদগধি ধিক্ ছটফটি এহ।
এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়এ দেহ ॥
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল ॥
এ বড় শেল আমার হৃদয়ে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল ॥
বড মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাঙ মরি ॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তাঁর সতি।
শ্যামসুধা না মিলিলে সভার সেই গতি ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৩৭

টীকা: দাবদগধি—আমি যেন দাবানলে পুড়িয়া মরিতেছি। চারিদিক বেড়া আগুন, তাহার মধ্যে ছট্‌ফট্ করিতেছি; যে দিকে যাই, সেই দিকেই আগুনের জ্বালা। জানুক তাঁর সতি—সত্য সত্যই তিনি আমাকে ভুলিয়াছেন কি না। শ্যামসুধা না মিলিলে···ইত্যাদি—শ্যামচাঁদের সুধা না পাইলে শ্রীরাধার মতন সকলকেই দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়।

২২৭. তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি ॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরিতের ফান্দ ॥
—পদা.সমুদ্র পৃ ৩৭২; তরু. ১৬৫৯

২২৮. নবঘনশ্যাম অহে প্রাণ!
আমি তোমা পাসরিতে নারি।

তোমার বদন-শশী অমিয়া মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি
তবে তোমা দেখিতুঁ সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥
এমন বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিলুঁ তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহিব কহন না যায় ॥
এবে সে বুঝিলুঁ সখি পরাণ সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিলে বাদ
নরোত্তম জীবন অপায় ॥

—পদা.সমুদ্র পৃ ২৯৫ ; তরু. ১৬৫৪

টীকা: তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি—প্রথমেই যদি তোমার নাম বুকে অঙ্কন করিতাম, তাহা হইলে সব সময় তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

২২৯. শকতি খীন অতি উঠই না পারই কাতরে সখিমুখ চাই।
পরশি ললাট করহিঁ মুখ ঝাঁপল পদুমিনি হিমকর ধাই ॥
মাধব! করুণা কি লব তোহে নাই।
এক বেরি বিরহ-বেয়াধি নিবারহ এ দুহুঁ পদ দরশাই ॥
রাই উপেখি ধরণি পর লুঠই কত কত সারঙ্গ-নয়নী।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত জিবইতে সংশয় জানি ॥
এত দিনে নবমি দশা পরিপূরল শ্বাস বহই উধ মন্দ।
মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত ॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ৩৫৭ ; তরু. ১৯২৮

টীকা: পদুমিনি হিমকর ধাই—যথা পদ্মিনী চন্দ্রং ধাবতীত্যনুভূতেপি ময়া মোহদশায়ামপি সৌন্দর্য্যমস্তীতি সূচিতং—রাধামোহন ঠাকুর। সূর্য অস্ত গেলে ও চন্দ্র উঠিলে পদ্মফুলের সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায়, তেমনি তাঁহার সৌন্দর্য ম্লান হইলেও অন্তর্হিত হয় নাই। রাই উপেখি ধরণি ইত্যাদি—রাধা চাহেন না যে, কৃষ্ণের কাছে তাঁহার মরণাপন্ন দশার খবর পাঠানো হউক, কিন্তু তাঁহার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার হরিণনয়না বহু সখী—মথুরায় যাইবে এমন পথিকের চরণে পড়িয়া অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন কৃষ্ণকে রাধার জীবন-সংশয়

হইয়াছে, এই কথা জানান। শ্বাস বহই উধ মন্দ—অল্প উর্ধ্বশ্বাস বহিতেছে।

২৩০. তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায় ॥
কাঁহা দিব্যাঞ্জন মোর নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু-শীতল কাঁহা নবঘনশ্যাম ॥
অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাঁহা মুরলী-বদন ॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন!
উনমতি হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন ॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখি কয়য়ে বিষাদ ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর ॥—পদা.সমুদ্র পৃ ৩৬৪ ; তরু. ১৯৪৫

টীকা : উভরায়—উচ্চশব্দে। উনমতি—উন্মত্ত হইয়া। ভোর—মত্ততা, ভুল হওয়া।

২৩১. রাইর বিপতি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
পুন পুন পরশই নাসা ॥
বিছুরল চরণ- রণিত মণিমঞ্জীর
বিছুরল মুরলীকো রঙ্গে।
বিছুরল বেশ ভূষণ ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখি-পুচ্ছচন্দ্রে ॥
মলয়জ পরিমলে দশ দিশ আমোদিত
যামিনী বহে অতি পুঞ্জে।
লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিনে মিলল কুঞ্জে ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে অথির ভেল দুহুঁ তনু
পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ।
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধরে বিধুবর ঝাঁপ ॥ —ক্ষণদা. ১৪।৫

টীকা : রাধার বিপত্তির কথা শুনিয়া রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গদগদ হইয়া তাঁহার

কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ নাগর নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন, যাইতে যাইতে বারংবার নাসা স্পর্শ করিতে লাগিলেন—খুব দ্রুতবেগে যাইবার জন্য নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। তিনি চরণের মণিনূপুর ভুলিলেন, মুরলীর রন্ধ্র ভুলিলেন, বেশ ভুলিলেন, অলঙ্কার খুলিয়া পড়িতে লাগিল, মাথার চূড়াও খুলিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে চন্দনের গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত হইল, রাত্রি তখন গভীর। দুই জনেই দুই জনকে দেখিবার ও স্পর্শ করিবার জন্য আকুল। বহুদিন পরে উভয়ের কুঞ্জে মিলন হইল। উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিতে অস্থিরদেহ হইলেন। বাহুতে বাহুতে স্পর্শ হইতেই কম্পন উপস্থিত হইল। নরহরির হৃদয়ের মাঝে এক অপরূপ চিত্র জাগিল—যেন মেঘ (শ্যামমেঘ) চন্দ্রকে (রাধাকে) ঝাঁপিল।

২৩২. দূতিমুখ শুনইতে ঐছন ভাষ।
ঝর ঝর লোচন ঘন ঘন শ্বাস॥
পরিহরি মাথুর করল পয়ান।
লোরহি পন্থ বিপথ নাহি জান॥
দূতি-অনুসারে চললি অনুসারি।
ছুটল কুঞ্জর গতি অনিবারি॥
কর ধরি দূতি মিলাওল কুঞ্জে।
চিরদিনে পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥,
হেরি সখি জয় জয় মঙ্গল দেল।
শিবানন্দ সহচরি জীবন ভেল॥ —তরু ১৮৫১

টীকা: শ্রীকৃষ্ণ দূতীর মুখে শ্রীরাধার অবস্থার বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন—তাঁহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি মথুরা ত্যাগ করিয়া চলিলেন—চোখের জলে পথ বিপথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শুধু দূতীকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন—হাতী যখন ছোটে, তখন যেমন কেহ তাহাকে রুখিতে পারে না, তেমনি তিনি অনিবার গতিতে চলিলেন। দূতী হাতে ধরিয়া তাঁহাকে রাধার সহিত কুঞ্জে মিলিত করিলেন। বহুদিন পরে আনন্দরাশি পাইলেন। সখীরা দেখিয়া মঙ্গলসূচক জয় জয় ধ্বনি করিলেন অথবা হুলুধ্বনি করিলেন। তাহাতে সহচরীরূপী শিবানন্দ জীবন পাইলেন।

বিংশ স্তবক

দিব্যোন্মাদ

২৩৩. একদিন গোপীভাবে জগত ঈশ্বর।
বৃন্দাবনে 'গোপী গোপী' বোলে নিরন্তর॥
কোনো যোগে তহিঁ এক পড়ুয়া আছিল।
ভাবমর্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল॥
'গোপী গোপী' কেনে বোল নিমাঞি পণ্ডিত।
'গোপী গোপী' ছাড়ি কৃষ্ণ বোলহ ত্বরিত॥
কি পুণ্য জন্মিব 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে॥
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বোলে 'দস্যু কৃষ্ণ, কোন জনে ভজে॥
কৃতঘ্ন হইয়া বলি মারে দোষ বিনে।
স্ত্রী জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে॥
সর্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে'॥
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ —শ্রীচৈতন্যভাগবত ২।২৬।৩৫৫

টীকা: নবদ্বীপে ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভ্রমর-গীতার দিব্যোন্মাদের প্রভাবে এই লীলা করিয়াছিলেন। স্তম্ভ হাতে লৈয়া—প্রভুর মাটির ঘর, বাঁশের খুটি ছিল; সেই খুঁটি একখানি লইয়া ছাত্রকে মারিতে গেলেন। ভণিতার অর্থ: জান=যান=যাঁহাদের। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ যাঁহাদের (আপন জন), তাঁহাদের পদযুগে বৃন্দাবন দাসের গান।

২৩৪. উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী বধে সাবধান॥
সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায়, না রহে পরাণ॥

কুটিল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাসিতে ॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥
এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীগৌরহরি
উঘাড়িঞা দুঃখের কবাট।
ভাবের তরঙ্গ বলে নানারূপে মন ছলে
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ —শ্রীচৈ. চ. ২।২

২৩৫. তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখই
মানিনী বদন ফেরি ॥
প্রাণ সহচরি চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোই ॥
মুদিত নয়নে কহত মাধব
কাঁহে না মিলল সোই ॥
কানু হে, রাইক ঐছন কাজ।
আট পহরে তো বিনু সাজই
আটহু নায়িকা সাজ ॥
হংস গুঞ্জিতে উমতি ধাবই
তোঁহারি নূপুর মানি।
হাসি আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
শেজ বিছাঅই আনি ॥
নীল নিচোল সঘনে মাগই
নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনাঅহ মোরি ॥
কোকিল রবে চমকি উঠই
নিয়ড়ে না হেরি তোরি।

সোঙরি মথুরা গমন তোহারি
ঘুরই পড়লি গোরি ॥
নিঝর নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোঁহারি চরণে এ সব কহিতে
ধাওত গোবিন্দদাস ॥

—রসকলিকার (পৃ ১১৯) পাঠ দেওয়া হইল ; পদা-সমুদ্র পৃ ৩৭৪ ; তরু. ১৯৬৩

টীকা : দূতী মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার উদ্‌ঘূর্ণা দশা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরাধা আট প্রহরে আট প্রকার নায়িকার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জিকা, অভিসারিকা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা—এই আট প্রকার নায়িকার ভাব একই দিনে শ্রীরাধিকার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। ভোরবেলায় নীল গগনে সিন্দুরবর্ণের তরুণ অরুণ উঠিতেছে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে হয় যে, নীল আকাশ যেন শ্যামসুন্দর, আর তরুণ অরুণ যেন তাঁহার কপালে প্রতিনায়িকার সিন্দুরবিন্দুর ছাপ। তাহা দেখিয়া তিনি খণ্ডিতা নায়িকার ন্যায় তোমার উপর যেন ক্রোধ প্রকাশ করেন, মানে মুখ ফিরাইয়া থাকেন। একটু পরেই কলহান্তরিতার ভাবে প্রিয় সখীকে পায়ে ধরিয়া সাধেন যে, কানুকে কোন রকমে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আনিয়া দাও। আবার উৎকণ্ঠিতা হইয়া চোখ বন্ধ করিয়া বলেন, 'সখি ! বল তো, মাধব কেন আসিল না ?' হংসধ্বনি শুনিয়া তিনি ভাবেন, বুঝি তোমার নূপুরের শব্দ শোনা গেল, অমনি পাগলিনীর মতন ছুটেন। তার পর হাসিয়া অলঙ্কার পরিধানপূর্বক শয্যা বিছাইয়া বাসকসজ্জায় প্রতীক্ষা করেন। আঁধার রাত্রিতে সহসা নীল শাড়ী চাহিয়া লইয়া অভিসারে বাহির হন। আবার তোমার সাথে যেন নিদ্রিত হইয়া সহসা স্বাধীনভর্তৃকার (দয়িত যাহার অধীন ; স্ব / নিজ অধীন ভর্তা যাহার, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে) ভাবে বলেন, 'আমায় বেশভূষা পরাইয়া দাও।' আবার কোকিলের শব্দে বিরহাকুল হইয়া পড়েন। যখন তোমাকে নিকটে না দেখেন, তখন পাগলিনীর মতন হন। তার পর তুমি মথুরায় চলিয়া গিয়াছ স্মরণ করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সখীরা অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিতে থাকে, তাঁহার শ্বাস বহিতেছে কি না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কবি গোবিন্দদাস তোমার চরণে শ্রীরাধার অবস্থা নিবেদন করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিয়াছে।

২৩৬. যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে
সোই নিকুঞ্জ সমাজ।

সুমধুর গঞ্জনে সব মন রঞ্জনে
মিলল মধুকররাজ ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত
হেরইতে বিরহিণী রাই।
সখী অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠল চেতন পাই ॥
অলি হে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন তবহুঁ তোহারি ॥
পুররঙ্গিণী কুচ- কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বনমাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥ —তরু. ১৬৫৬

টীকা: যে নিকুঞ্জে বসিয়া রাই প্রলাপ বলিতেছেন, সেই নিকুঞ্জের সখীগণের মধ্যে এক ভ্রমর সর্বজনমনোরঞ্জনকারী সুমধুর শব্দ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাধার চরণের নিকট উড়িয়া যাইতেছে, তাহা দেখিতে পাইয়া বিরহিণী রাধা চেতনা পাইয়া সখীর কাঁধে ভর দিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন—হে ভ্রমর, তুমি আমার চরণ ছুঁইও না; কেননা, কানুর মতই তোমার বর্ণ এবং গুণও (নানা ফুলে মধু খাও)। কানাইয়ের গলায় এখন যে বনমালা রহিয়াছে, তাহা মথুরাপুরীর নাগরীদের কুচকুঙ্কুমের দ্বারা রঞ্জিত এবং সেই কুঙ্কুম আবার তোমারও মুখে লাগিয়াছে। তাহা দেখিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে কবি জ্ঞানদাসেরও মুখ কালো হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৭।১২ শ্লোকের ভাব লইয়া এই পদ লিখিত হইয়াছে—

মধুপ! কিতববন্ধো! মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥

শচীনন্দন বিদ্যানিধি-কৃত অনুবাদ (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা পৃ ১৫৫)—

ভ্রমর! ভণ্ডের মিতা, চরণে না দিও মাথা
সপত্নীকুচের যে মালা।
তাহার কুঙ্কুম লয়া নিজ শ্মশ্রু রাঙ্গাইয়া
তুমি কেন ব্রজপুরে এলা ॥
যার দূত তুমি হেন জন।

মানিনী মথুরা নারী তার প্রসাদকর হরি
যদু-সভায় পাবে বিড়ম্বন ॥

২৩৭. ওরে কাল ভ্রমরা, তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ ॥
ব্রজবাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ অনল একে তনু ক্ষীণ শ্যাম-শোকে
নিভান আগুনি দিলা জ্বালি ॥
মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও ॥
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুঃখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥
সে সুখ সম্পদ মোর তুমি জান মধুকর
এবে সে আমার দুঃখ দেখ।
কহিও কানুর ঠাম ইহ বিরহিণী নাম
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ ॥ —তরু. ১৬৫৭

টীকা: উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪।১২ শ্লোকটি প্রজল্পের উদাহরণ-স্বরূপ ধৃত হইয়াছে। প্রজল্পে অসূয়া, ঈর্ষা ও মদযুক্ত অবজ্ঞা প্রভৃতির অকৌশল উক্তি থাকে। এখানে 'কাল ভ্রমরা তোর মুখে নাহি লাজ' বাক্যে অসূয়া, পূর্বের পদে 'পুররঙ্গিণী কুচকুঙ্কুম' শব্দে অকৌশল ও ঈর্ষা এবং এই পদে 'আমার মন্দিরে কিবা কাজ' বাক্যে মদ প্রকাশ পাইয়াছে।

২৩৮. সকৃৎ অধরমধু করাইয়া পান।
তেজি গেলা কৃষ্ণ যেন তুহারি সমান ॥
কিরূপে কমলা দেবী সেবে পদযুগে।
এমত বঞ্চকে না বাড়াই অনুরাগে ॥
হেন বুঝি তাহার উত্তম যশ শুনি।
ভুলিলা কমলাদেবী তত্ত্ব নাহি জানি ॥
—ভাগবত ১০।৪৭।১৩-এর অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

টীকা: দয়িতের নিষ্ঠুরতা, শঠতা ও চাপল্য দেখাইয়া যাহাতে নিজের বিচক্ষণতা প্রমাণ করা হয়, তাহাকে শ্রীরূপ গোস্বামী পরিজল্প নাম দিয়াছেন।

একবার মাত্র অধরসুধা পান করানোতে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা, তাহার পরই ত্যাগ করায় নিষ্ঠুরতা।

'তুহারি সমান'—ভ্রমরের মতন বলায় শ্রীকৃষ্ণের চাপল্য এবং কমলা সরলা বলিয়া তোমার 'উত্তমযশঃ' বিশেষণ শুনিয়াই ভুলিয়াছেন, আমরা বিচক্ষণ—উহাতে ভুলি না।

একবিংশ স্তবক

ভাবোল্লাস

২৩৯. আসিবে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া সচকিত হৈয়া
করব মঙ্গল-কাজ॥
জলঘট ভরি আম-শাখা ধরি
রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া
ফুল-মালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া নদীয়া-নাগরী
ধাওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি জয় জয় বাণী
উঠিবে সকলে ঘরে॥
শুনিয়া জননী ধাইবে অমনি
করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে ধোই কলেবরে
তুরিতে লইবে ঘরে॥
যতেক ভকত দেখি হরষিত
হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা পড়ি লোটাইয়া
লইবে চরণারবিন্দ॥ —তরু. ১৯৭৬

২৪০. রাজপুরাদ্ গোকুলমুপযাতম্।
প্রমদোন্মাদিত-জননী-জাতম্॥

স্বপ্নে সখি পুনরদ্য মুকুন্দম্ ।
আলোকয়মবতংসিত-কুন্দম্ ॥
পরম-মহোৎসবঘূর্ণিত-ঘোষম্ ।
নয়নেঙ্গিত-কৃত-মৎপরিতোষম্ ॥
নব-গুঞ্জাবলি-কৃতপরভাগম্ ।
প্রবল-সনাতন-সুহৃদনুরাগম্ ॥ —গীতাবলী

সখি! আমি আজ আবার মুকুন্দকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহার কর্ণে কুন্দফুলের অলঙ্কার। তিনি রাজপুরী মথুরা হইতে যেন গোকুলে আসিয়াছেন। তাঁহার পিতামাতা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। গোপগণ মহোৎসবে নাচিতেছেন। তিনি তখন অপাঙ্গদৃষ্টির দ্বারা আমার সন্তোষবিধান করিলেন। তাঁহার প্রবল সনাতন বন্ধুবাৎসল্য দেখিলাম, বা সনাতনের প্রতি তাঁহার প্রবল স্নেহ দেখিলাম।

২৪১. বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন
দেখিব পিয়ার মুখ ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দু জনার একই কথা।
বন্ধু আসিবার ঠিকন সোধাইতে
নাগিনী নাচায় মাথা ॥
ভ্রমরা কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধয়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছন পূরব নিত ॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ
কভু না হইবে আন ॥ —তরু. ১৭৭৭

২৪২. অচিরে পুরব আশ।
বন্ধুয়া মিলিবে পাশ ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর ॥
অধর অমৃত দিয়া।
প্রাণদান দিবে পিয়া ॥

পুলকে পুরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ॥
ছল ছল দু নয়ানে।
চাহিব বদন পানে॥
কিছু গদগদ স্বরে।
এ দুখ কহিব তারে॥
শুনিয়া দুখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত॥ —তরু. ১৯৮১

২৪৩. শুন হে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার করমের দুখ
সকলি করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতেশুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িলা শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ন লোরে॥ —মাধুরী. ৪।৩৯৬

সপ্তদশ শতাব্দী

অনুবাদ ও আলংকারিক রীতি অনুসরণের যুগ

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দকে যে ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা যায়। শ্রীনিবাস-শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁহার পদে বসন্তরায় ও বল্লভের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বসন্তরায়কে ষোড়শ শতাব্দীর মহাজনদের মধ্যে ধরিয়া বল্লভকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থান দেওয়ার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। কিন্তু গোবিন্দদাস, বল্লভ ও বসন্তরায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও পদ রচনা করিয়াছিলেন—এই কথা মনে রাখিলে আর শতাব্দীর স্থূল হিসাবের ফেরে পড়িতে হইবে না।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে কুমুদানন্দ, নরসিংহ দাস (কবিরাজ), শ্যামদাস কবিরাজ, প্রসাদদাস ও রাধাবল্লভ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। রাধাবল্লভকে সাধারণতঃ সুধাকর মণ্ডলের পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডলের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু 'রসকল্পবল্লী'তে এক রাধাবল্লভ চক্রবর্তীর পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কর্ণানন্দের (২) মতে শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্রবধূ সত্যভামা দেবীর শিষ্য ছিলেন রাধাবল্লভ চক্রবর্তী। রাধাবল্লভের সূচক পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহের একটি পদ সংকীর্তনামৃতে ধৃত হইয়াছে। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বলরাম কবিরাজ তাঁহার মাতুলের আলংকারিক রীতি অনুসরণ করিয়া ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছেন। ঘনশ্যামের রচনাতেও গোবিন্দদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট।

শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতার শিষ্য যদুনন্দন কবিরাজ 'বিদগ্ধমাধব' ও 'গোবিন্দ-লীলামৃতে'র সুললিত ভাবানুবাদ করিয়াছেন এবং স্বতন্ত্রভাবে পদরচনাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যদুনন্দনের শিষ্য গৌরদাসও বেশ ভাল পদ রচনা করিতে পারিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রামগোপাল চৌধুরী 'রসকল্পবল্লী' রচনা করেন এবং গোপালদাস ভণিতা দিয়া অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পদ লেখেন। ঐ সব পদের অধিকাংশ তাঁহার পুত্র পীতাম্বরের 'রসমঞ্জরী'তে স্থান পাইয়াছে। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে মনোহর 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থ লেখেন। তিনি বাংলায় ও ব্রজভাষায় কয়েকটি মনোরম পদ রচনা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গের কবি ভবানন্দ 'হরিবংশ' লেখেন।

উহাতে কয়েকটি ভাল পদ আছে। রাধাকৃষ্ণকে লইয়া গ্রন্থ লিখিলেও এবং শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করিলেও ভবানন্দকে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় না। তাঁহার গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামীর মতবিরুদ্ধ অনেক কথা আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উদ্ভব হয় নাই। শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর কাব্য, নাটক, অলংকারাদির অনুসরণ করিয়া বাংলা ভাষায় পদ রচনা করা ও রসশাস্ত্র প্রচার করাই এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম স্তবক

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

২৪৪. কাচা মরকত নবনি জড়িত
মনোহর তনুখানি।
হাসিঞা হাসিঞা অমিয়া মাখিয়া
বলে আধ আধ বাণী॥
পাখানি নাচায়্যা নূপুর বাজাঞা
বসিঞা মায়ের কোলে।
সোনায়ে জড়িত মুকুতা লম্বিত
শোভিছে নাসিকাতলে॥
গলায়ে জড়িত রুরু-নখ রুচি
গাথনি মুকুতা ঝুরি।
কুমুদানন্দ কহে এমন বালকের
নিছনি লইয়া মরি॥ —সংকীর্তনামৃত ৭০

কুমুদানন্দ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে (১৮) শ্রীনিবাস-নরোত্তমের শিষ্য কবিকুলের মধ্যে ইহার নাম করিয়াছেন।

২৪৫. মরি বাছা ছাড়রে বসন।
কলসী উলায়্যা তোমারে লইব এখন॥
মরি তোমার বালাই লয়্যা আগে আগে চল ধায়্যা
ঘাঁঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাথে খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী॥
মুঞি রহিনু তোমা লয়্যা গৃহকর্ম গেল বয়্যা
মোরে হবে কেমন উপায়।

কলসী লাগিল কাঁখে ছাড়য়ে অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পিয়ায় ॥
মায়ের করুণা ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজরায় ।
কিঙ্কিণী কাছনি ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
রাণী বলে সোণার বাছা যায় ॥
ভুবন মোহিয়া উড়ে অঙ্গুলের নখ বরে
সোনায় বান্ধিয়া থোপা তায় ।
ধাইয়া যাইতে পীঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ দাসে গুণ গায় ॥ —কীর্তনগীতরত্নাবলী ৪৬৮

২৪৬. পা খানি নাচায়্যা নূপুর বাজায়্যা
বসিয়া মায়ের কোলে ।
ঈষত হাসিয়া মাখন তুলিয়া
আধ আধ বাণী বোলে ॥
কাঁচা মরকত নবনী জড়িত
মনোহর তনুখানি ।
হাসিয়া হাসিয়া অমিয়া সিঞ্চিয়া
বোলে আধ আধ বাণী ॥
যাঁহা লাগি শিব ছাড়িয়া বৈভব
বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায় ।
শ্যামদাসে বোলে সে যে কুতূহলে
নন্দ গৃহে ধূলায় লোটায় ॥ —অ. পদরত্নাবলী ২৯৯

২৪৭. দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল ।
মণিময় নূপুর কটিপর ঘাঘর
মোহন উর বনমাল ॥
গোপিনী কতশত বালক যুথ যুথ
গায়ত বোলত ভাল ।
তীব্র দৃমিক ধ্বনি তাথৈ তাথৈ শুনি
নৃগধি তৃগধি বাজে তাল ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
নিকসত মোতিম দন্ত রসাল ।

শ্যামদাস ভণ জগজন-জীবন
সো পহুঁ পরম দয়াল ॥ —কীর্তনগীতরত্নাবলী ২১৩

দ্বিতীয় স্তবক

পূর্বরাগ

২৪৮. মুখে লৈতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহিব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গঢ়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি ॥
আপন মাধুরি গুণে আনন্দ বাঢ়ায় কাণে
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ যবে হয় তার নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে।
কৃষ্ণ দু আখর দেখি জুড়ায় তপত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য স্থান সব রস কৃষ্ণ নাম
এ যদুনন্দন দাস কয় ॥
—রসকদম্ব, বিদগ্ধমাধব ১।৩৩-এর অনুবাদ

শ্রীরূপ গোস্বামীর মূল শ্লোক এই—
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

ইহার অর্থ: 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুইটি যদি মুখে নটীর ন্যায় নৃত্যশীলা হয়, তাহা হইতে অনেকসংখ্যক মুখ পাইতে ইচ্ছা হয়, যদি কর্ণক্রোড়ে অঙ্কুরবতী হয় তাহা হইলে দশকোটি কাণ পাইতে স্পৃহা জাগে, আর যদি চিত্তের প্রাঙ্গণে অর্থাৎ মনের মধ্যে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাজিত করে, সুতরাং জানি না কত অমৃত দিয়া ইহা তৈয়ারি হইয়াছে। মন্তব্য: যদুনন্দন 'নাম আর তনু ভিন্ন নয়' স্বাধীনভাবে যোগ করিয়াছেন।

২৪৯. কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
হা হা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
যাতে কোন দশা কৈল মোহ।
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ॥
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
রহ তুমি চিত্তে বান্ধি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে মিশাল করিঞা।
হিম নহে সব তনু কাঁপাইছে হিমে জনু
প্রতি তনু শীতল করিঞা॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাতারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥
এতেক কহিতে ধনী উদ্বেগ বাড়িল জনি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা বুইলে দেখি
মুরলীর নহে হেন রীতে॥
কোন সুনাগর এই মোহমন্ত্র পড়ে যেই
হরিতে তোমার ধৈর্যমত।

দেখিয়া ঐ সব রীত চমক লাগিল চিত
দাস যত্নন্দনের মত ॥
—রসকদম্ব, বিদগ্ধমাধবের ১।৬৯-এর অনুবাদ

শ্রীরূপের মূল শ্লো কটিএই—

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরিতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্নজানে।
হা হা কুলীন-গৃহিণীগণ গর্হনীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি ॥

ইহার অর্থ: জানি না কদম্বতরুর মধ্য হইতে অকস্মাৎ কোন একটি শব্দ উদ্গত হইয়া আমার কর্ণপদবীতে প্রবেশ করিয়াছে। হায়, উহাতে আমি কুলীনগৃহিণীদের নিন্দনীয়া কোন অনির্বচনীয় দশা পাইয়াছি।

পদকল্পতরুতে (১৪২) ইহার শেষ দুই কলি নাই! পদরসসারের (১২৮) পুথিতে ঐ দুই কলির বিকৃত পাঠ আছে। উহাতে আছে—

কহে শুন আরে সখি মিছাই কহিলা
মুরলি নহে হেন চিতে ॥

২৫০. কহ কহ সুবদনি রাধে।
কি তোর হইল বিআধে ॥
কেনে তোরে আন মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লেখি ॥
হেমকান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গাবাস খসিঞা পড়িল ॥
আঁখিযুগ অরুণ হইল।
মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল ॥
কি লাগিয়া এমন হইলা।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥
এত শুনি কহে ধনি রাই।
এ যত্নন্দন মুখ চাই ॥ —তরু. ৩১

২৫১. যব ধরি পেখলুঁ কালিন্দী তীর।
নয়নে ঝরয়ে কত বারি অথীর ॥
কাহে কহব সখি মরমক খেদ।
চীতহি না ভায়ে কুসুমিত শেজ ॥

নব জলধর জিতি বরণ উজোর।
হেরইতে হৃদি মাহা পৈঠল মোর॥
তব ধরি মনসিজ হানয়ে বাণ।
নয়নে কানু বিনু না হেরিয়ে আন॥
দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরামা।
রাই কানু একতনু দুহুঁ একুঠামা॥ —সংকীর্তনামৃত ১৯১

দিব্যসিংহ গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র ও ঘনশ্যাম দাসের পিতা। পদটির মধ্যে ব্যঞ্জনার অভাব দেখা যায়।

২৫২. দুর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি।
যৌবনজল তাহে শ্যামর কাঁতি॥
দেখ সখি না বুঝিয়ে দৈবকি রীত।
তহি ডারল মঝু নিরমল চিত॥
ধৈরয আদি সকল গুণ মেলি।
নিশিদিশি বসিয়া করতহি কেলি॥
সো সব গুণ অব আকুল হোয়।
চরণে লাগি পুন রোওই মোয়॥
না বুঝিয়ে তছু যো নিজঘর খোই।
রহইতে শকতি অবধি করু কোই॥
কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত।
বিপতি সময়ে করু সব বিপরীত॥
ধৈরয পদ অবলম্বন কেল।
মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল॥
কহ ঘনশ্যামর দাস উচিত।
বাঁধি লেহ তুহু শ্যামর চিত॥ —গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৬ষ্ঠ পদ

শব্দার্থ : দুর অবগাহ—যাহাতে সহজে অবগাহন করা যায় না। পয়োনিধি—সমুদ্র। রোওই মোয়—আমাকে কাঁদাইতেছে।

টীকা : তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন দুরধিগম্য সমুদ্র আর তাহার শ্যামল কান্তি যেন যৌবনের জল। সখি দৈবের কি রীতি বুঝি না, তাহারই মধ্যে (সেই জলের মধ্যে) আমার নির্মল চিত্তকে নিক্ষেপ করিল। ধৈর্য প্রভৃতি সকল গুণ রাতদিন বসিয়া খেলা করিত, এখন সেই সব গুণ আকুল হইয়া (চিত্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া) চরণে ধরিয়াছে এবং আমাকে কাঁদাইতেছে। যে নিজের ঘর খোয়াইয়া অন্য স্থানে থাকিবার জন্য চরম চেষ্টা করে তাহাকে বুঝি না। বিপদের সময় নিজ ও পর, হিত ও অহিত, সকলেই বিপরীত ব্যবহার করে। ধৈর্য আমার চরণকে

চাপিয়া ধরিয়াছে, তাই ঘরে ফিরিয়া যাওয়া সঙ্কট হইল। ঘনশ্যাম দাস উচিত কথা বলিতেছেন, তুমি শ্যামের চিত্ত বাঁধিয়া লও।

২৫৩. অলখিত গতি জিতি বিজুরী সঞ্চার।
চৌদিশে ধাবই লোচন তার॥
এ সখি অতয়ে না পায়লুঁ ওর।
কৈছনে চিত চোরায়ল মোর॥
জানলুঁ অবহুঁ কয়ল মুঝে হাত।
অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত॥
লোচন যুগলে লোর পরিপূর।
কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর॥
চলইতে চরণ অচল সম ভেল।
কুলবতী-ধরম করম দূরে গেল॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥
—গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৫ম পদ ; তরু. ১৫১

টীকা : তাহার গতি বিদ্যুৎ-চমককেও হারাইয়া দেয়, কাজেই তাহাই ভাল করিয়া দেখা যায় না। শুধু আমার লোচন-তারা চারিদিকে তাহাকে খুঁজিতে থাকে। সখি হে, এইজন্য বুঝিতে পারিলাম না কি করিয়া আমার চিত্ত চুরি গেল। এইটুকু মাত্র জানিলাম যে আমাকে সে হাত করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমার সমস্ত দেহ অবশ হইল। চোখ দুটিতে জল ভরিয়া থাকে, কথা বলিতে গেলে মুখে কথা বাহির হয় না। চলিতে গেলে পা যেন পাহাড়ের মতন অচল হয়। আমার কুলবতী-ধর্ম ও কর্ম সব নষ্ট হইল। এর পরও যে তাহার মনে আর কি অভিলাষ আছে তাহা ঘনশ্যাম দাস বুঝিতেছেন না।

২৫৪. সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর
আর তাহে কুটীল কটাখি।
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরয-শাখি॥
এ সখি বিহরয়ে কো পুনঃ এহ।
পীতবসন জনু বিজুরি বিরাজিত
সজল-জলদ-রুচি দেহ॥
মৃদু মৃদু ভাষ হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি।

যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী
হেরই রহু পুন ভাগি ॥
তঁহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি ঐছন
জন জন হৃদয়ম মাঝ।
—গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৪র্থ পদ ; তরু. ১৫০

২৫৫. হেদে রে কদম্ব-তরু
তুমি নি পাইয়াছ শ্যাম-রায়।
তোমার ডালে ত থাকি মোর নাম ধরি ডাকি
নিরবধি বাঁশীটী বাজায় ॥
বসায়্যা আপন ডালে আপনা ফুলের মালে
রেণুয়ে ভরিয়া তনুখানি।
নবীন পল্লব সনে তোমার কলিকাখানে
অবলা কি হইব মানিনী ॥
পরিহরি খগবর তোমাতে মুরলী-ধর
পদ-ধূলি লাগে তোমার গায়।
যখন বৈসয়ে মূলে শীতল ছায়ায় ভুলে
ভাগ্য তোর কহন না যায় ॥
...
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হৈয়া অধরে মুরলী থুইয়া
সদায়ে হেলান দিয়া থাকে।
কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন
কৃপা বড় করিল তোমাকে ॥ —ভবানন্দের হরিবংশ

টীকা : রেণুয়ে ভরিয়া তনুখানি—কদম্বফুলের রেণুতে কৃষ্ণের দেহ আচ্ছন্ন হয়। পরিহরি খগবর—বিষ্ণুর বাহন গরুড়, তাহা ত্যাগ করিয়া।

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উতর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান ॥
সখি হে কি ভেল এ বর নারী।

করহুঁ কপোল থকিত রহু ঝামরি
জনু ধন-হারি জুয়ারি ॥
বিছুরল হাস রভস রস-চাতুরি
বাউরি জনু ভেল গোরি।
ঘনে ঘনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি ॥
কাতর কাতর নয়নে নেহারই
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি ॥
ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥

মন্তব্য: গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গীর অনুসরণ দেখিয়া মনে হয় যে এই পদটির রচয়িতা বলরাম কবিরাজ, যাঁহার সম্বন্ধে পদকল্পতরুর সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন—

কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁজন নিরুপম গুণ গান
গৌর-প্রেমময়-ধাম ॥

ঘনশ্যাম গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র। বলরাম তাঁহার ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

২৫৭. লুঠই ধরণি ধরি সোয় ॥
শ্বাসবিহিন হেরি সহচরি রোয় ॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই।
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই ॥
কেহ কেহ জপয়ে দেবদিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহ পূজে জ্যোতিষি আনি ॥
কেহ নাসা ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহবিঘন কেহ দেখই না পারি ॥

শেষ দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হয় পরিণাম॥ —তরু. ১৮০

তৃতীয় স্তবক

খণ্ডিতা

২১৮. কি লাগি আমার গৌর-রায়।
আবেশে শ্রীবাস-মন্দিরে যায়॥
কিবা ভাবে গোরা জাগিল নিশি।
কি লাগি মলিন বদন-শশী॥
আলসে আউলাঞা পড়িছে গা।
চলিতে না চলে কমল-পা॥
গৌর বরণ ঝামর ভেল।
নিশি শেষে কেবা এ দুখ দেল॥
কহয়ে রসিক ভকতগণ।
রাধার ভাবে বিভাবিত মন॥
পরসাদে কহে আমার গোরা।
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা॥ —তরু. ৩৯০

মন্তব্য : পদকর্তা প্রসাদদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য (কর্ণানন্দ ১)। পদটি বাসু ঘোষের রচনার ব্যর্থ অনুকরণ। বাসু ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া পদ লিখিয়াছেন, আর প্রসাদ খণ্ডিতার পালার প্রথমে একটি গৌরচন্দ্রিকা লেখার তাগিদে এটি রচনা করিয়াছেন। ন্যাসি-চূড়ামণিকে খণ্ডিতার নায়ক সাজাইবার দুঃসাহস সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছিল। নরহরি সরকার ঠাকুর গৌরাঙ্গকে খণ্ডিতার নায়িকা করিয়া আঁকিয়াছেন। পদকল্পতরুতে বাসু ঘোষের নিম্নলিখিত পদটি খণ্ডিতার গৌরচন্দ্রিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—

আজি কেনে গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়্যাছে মনে সজল নয়ান॥
মুখচান্দ সুখাঞাছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে॥
আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায়॥

বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল॥

ইহাতে গৌরাঙ্গের ভাবাবেশের ছবিটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, লাম্পট্যের কথা ঘুণাক্ষরেও নাই। প্রসাদের পদে 'নিশি শেষে কেবা এ দুখ দেল' বলার মধ্যে কেলি-বিলাসের ইঙ্গিত দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই রাধাভাবে বিভাবিত, কিন্তু প্রসাদ বলেন যে তাঁহার রসিক ভক্তেরা রাধার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রভুকে অন্যত্র রাত্রিবাসের জন্য গঞ্জনা দিতেছেন।

২৫৭. চন্দনে চরচিত সবহু কলেবর
নীলবসন পরিধান।
অরুণিত লোচন- যুগল ঢুলুঢুলু
দিগ দলি আওত কাণ॥
দূরে হরি সুন্দরী ভবনহি পৈঠল
হলধর আওল জানি।
ললিতা নতমুখী হাসি হাসি অঙ্গনে
আসন দেয়ল আনি॥
যব তহি বৈঠল কাণ।
করে কর সুন্দরী গলে অম্বর ধরি
ভরমে করল পরণাম॥
লহু লহু পুছই রোহিণীক মঙ্গল
ললিতা সখী করি আড়।
ঐছন বচন শুনি হরি অন্তরে
ভয় উপজল গাঢ়॥
রোহিণী মঙ্গল পুছ তুহুঁ সুন্দরি
সো হোয়ত মঝু জেঠ।
রামানুজ হাম প্রাতরে আওলুঁ
তুয়া সঙ্গে করইতে ভেট॥
ঐছন বচন শুনি ধনি অন্তরে
অতিশায় মতি ভেল বাম।
দাস মনোহর তুহুঁ বহুবল্লভ
রজনী বঞ্চলি কোন ঠাম॥ —কীর্তনগীতরত্না. পৃ ৮৭

টীকা: ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে যে মনোহর দাস 'অনুরাগবল্লী' রচনা করিয়াছেন, তিনিই এ পদের রচয়িতা।

বলরাম নীলবসন পরেন, বারুণী পান করিয়া তাঁহার চোখ লাল ও ঢুল ঢুল।

কৃষ্ণ মনের ভুলে চন্দ্রাবলীর নীল শাড়ী পরিয়া আসিয়াছেন। রাত্রিজাগরণহেতু তাঁহার চোখ ঢুল ঢুল হইয়াছে। রাধিকা তাঁহাকে বলরাম মনে করিয়া ভাসুর জ্ঞানে হাতজোড় করিয়া (করে কর) গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন, ললিতাকে আড়াল করিয়া বলরামের মা রোহিণীদেবীর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ললিতা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া 'হাসি হাসি অঙ্গনে/আসন দেয়ল আনি'।

২৬০. গগনহি এক চান্দ নাহি দোসর
ধরু তাহে নীলিম চীন।
অরুণ উদয়ে পুন লাজে মলিন-তনু
বেকত না হোয়ত দীন॥
মাধব অপরূপ তোহারি বিলাস।
তুয়া উর-অম্বরে চান্দ-ঘটা অব
দিনহিঁ হোত পরকাশ॥
বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতি
অরুণ ঘটায়ল তায়।
তছু সেবন বিনু প্রাতরে তোহে পুন
অনত গমন না যুয়ায়॥
জানলুঁ অতয়ে করলি হাম কহু পুণ
তাহে তুহুঁ অবহুঁ না যাব।
কহ ঘনশ্যাম- দাস নহে কৈছনে
ঐছন দরশন পাব॥—গোবিন্দরতি. ১৫; তরু. ৩৮৪

টীকা: আকাশে চাঁদ একটি, তাহার দোসর কেহ নাই; সে কলঙ্কচিহ্ন ধারণ করে। সূর্যের উদয়ে সে লজ্জায় মলিনদেহ হয়, তাই দিনের বেলায় প্রকাশ পায় না। মাধব! তোমার লীলা অপূর্ব দেখিতেছি। তোমার বক্ষোরূপ আকাশে এখন অনেক চাঁদের (নখক্ষতরূপ) ঘটা দেখিতেছি—তাহারা দিনের বেলাতেই প্রকাশ পাইতেছে। কোন্ কলাবতী সেই চন্দ্রের সঙ্গে আবার অলক্তকরাগরূপ সূর্যের প্রকাশ ঘটাইল? বিধাতাও যে একসঙ্গে সূর্যচন্দ্রের প্রকাশ ঘটাইতে পারেন না, সুতরাং তাহার শক্তি দেখিতেছি বিধাতার চেয়েও বেশি। এমন কলাবতীর সেবা ছাড়িয়া তোমার পক্ষে সকালবেলা অন্যত্র যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব বুঝিলাম আমি বহু পুণ্য করিয়াছি, তাই তুমি এখনও যাইতেছ না। ঘনশ্যামদাস বলেন, পুণ্য না করিলে আর ঐরূপ দর্শন পাইবে কেন? (এটি ভক্তি করিয়া বলা নহে, ব্যঙ্গ করিয়া বলা)।

২৬১. দেখ সখি হোর কিয়ে নাগর-রাজ।
বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে
কোন কয়ল ইহ কাজ ॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আয়ত ইহ মঝু কান্ত।
স্থল-পঙ্কজ-দল নয়ন-যুগল-বর
যামিনী জাগি নিতান্ত ॥
মুখ-বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণ-কিরণ-ভয়-লাগি।
অলক-নিকর উড়ু ভাল-গগন পর
নিশি-অবসান ভয় ভাগি ॥
বান্ধুলি অধরে হেরি জনু নীলিম
কাজর করি অনুমান।
অপরূপ দশন কাঁতি জনু দরপণ
সো অব রঙ্গিম ভান ॥
উরপর নখ-পদ তনু তনু নিরমদ
অনুখন অলসে বিভোর ॥
যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড় ॥
শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।
দূরহি দীগ- বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহিঁ ভেল ॥
টলমল চরণ- যুগল মণি-মঞ্জির
ঝনর ঝনর ঝন বাজে।
কহ বলরাম- দাস ইহ বিপরিত
হেরত নাগর-রাজে ॥ —তরু. ৩৮০

টীকা : পদের ভাষা ও রচনাভঙ্গী জানাইয়া দিতেছে যে ইহা গোবিন্দদাস কবিরাজের পরবর্তীকালের রচনা। এই বলরাম তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। মুখ-বিধুরাজ···ইত্যাদি—মুখচন্দ্র এখন মলিন হইয়াছে, বোধ হয় অরুণ-কিরণের ভয়ে। আর তোমার কপালের উপর কেশরাজি উড়িতেছে; তাহারা অন্ধকারের প্রতীক, তাই রাত্রিশেষে ভয়ে যেন পলাইতেছে। দূরহি দীগবসন জনু হেরিয়ে—দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তুমি নগ্ন রহিয়াছ।

২৬২. ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলে সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বন্ধুয়া হে তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাণ্ডাও তোমার চান্দ মুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে রূপ কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনিমন লোভা ॥
খর নখদংশনে ভেল অঙ্গ জর জর।
ভাল সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের সাড়ী কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হয়্যা বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ অঙ্গে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে ॥
চারিপানে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ —রসমঞ্জরী

২৬৩. ছল করি বাণি কতয়ে পরলাপসি
তোমারি বচন পরমাণ।
চারি পহর রাতি জাগিয়া পোহায়লুঁ
আয়লি রাতি-বিহান ॥
মাধব আজি বড় দেয়লি দুখ।
আগে ইহ আরতি না বুঝিয়া অব তোহে
হেরি পায়লুঁ বড় সুখ ॥
ভালহি সিন্দুর কাজরে পূরল
বদনহি দশনক রেখ।
হেরইতে তোহে লাজ মোহে হোয়ত
যাবক-রাগ পরতেক ॥
কমলিনি পাই সরস-রসে ভুললি
না বুঝলি মালতি-গন্ধ।
কহই গোপাল- দাস নাহি সমুঝলি
কী ফুলে কিয়ে মকরন্দ ॥

টীকা: শ্রীরাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, আর কত মিছাকথা প্রলাপের মতন বকিবে। তোমার কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে উহা মিথ্যা। মাধব আজ বড় দুঃখ দিলে। আগে তোমার আসক্তির স্বরূপ বুঝি নাই, আজ বুঝিতে পারিলাম, এবং সুখী হইলাম! (ব্যঙ্গোক্তি)। পরতেক—প্রত্যক্ষ।

২৬৪. এতহুঁ বচন কহ মানিনি রাই।
কাতরে কানু মানায়ই তাই॥
বাহু পাকড়ি কত সাধই কান।
ঝটকত্ত কর কঙ্কণ ঝন ঝন॥
সমুখে কহয়ে কত কাতর বাণী।
বিমুখ ভেল তব কছু নাহি মানি॥
পড়ইতে চরণে চলই করি রোখ।
বাহু পসারি মানায়ত দোখ॥
চরণ হেলি ঠেলি চললহি গোরী।
রোই নাগর চলু লোরে বিভোরি॥
রোখে আয়ল ধনি আপনক বাস।
নাগর চলি গেও হইয়া নৈরাশ॥
কহে যদুনন্দন দাসক দাস।
গৌরদাস তহিঁ করু আশোয়াস॥ —তরু. ৩৭৭

টীকা: পদকর্তা নিজেকে যদুনন্দন দাসের দাস বা শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মানায়ই—তাহাই মানিয়া লইলেন। মানায়ত দোখ—দোষ স্বীকার করিলেন।

চতুর্থ স্তবক

প্রেম বৈচিত্ত্য

২৬৫. শ্যামর-চন্দ গোরি যব বৈঠল
নিধুবনে সখিগণ সঙ্গ।
চাতুরি রভস কলা কত কৌশল
কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙ্গ॥
সজনী কো পয়ে ঐছন জান।
পিয় পিয় পিপিয়-নাদ শুনি আকুল
মুরছি আনত ভই আন॥
ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত
কত কত করুণা-কোটি।
দন্তে তৃণহুঁ কহি প্রিয় দরশন দেহ
না হেরিয়া হিয়া যাউ ফোটি॥

বহুত বিনতি করি সখির করে ধরে
কোরহি শ্যাম না জান।
বিপরীত অচল সচল দেখি ঐছন
বল্লভদাস রস গান ॥ —তরু. ১৬৯; কীর্তনানন্দ ৩১৯

টীকা: নিধুবনে সখীগণকে লইয়া শ্যামচন্দ্র ও গৌরাঙ্গী রাধিকা যখন বসিলেন, তখন কত রসের চাতুরী ও কলাকৌশল প্রদর্শিত হইতে লাগিল ও কত মদনতরঙ্গ উঠিল। সখি, এমন সময়ে কে জানে কি ব্যাপার ঘটিল! পাপিয়া পিয় পিয় ডাকিতেছে শুনিয়া রাধিকা আকুল হইলেন, তিনি মূর্ছিতা হইলেন; সব অন্যরকম হইয়া গেল। তাঁহার চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি কত করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মিনতি করিয়া দন্তে তৃণ লইয়া বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয় তুমি দেখা দাও, তোমাকে না দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সখীর হাত ধরিয়া কত বিনতি করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেই পারিলেন না যে শ্যাম তাঁহার কোলেই আছে। পাহাড় চলিতে আরম্ভ করার মতন এই অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া বল্লভদাস এই রস গান করিতেছেন।

২৬৬. ধনি-কোরে বিনোদ নাগরবর ভুললা।
রোয়ত নীর বয়ন বহি গেলা ॥
কোরে আকুল ভই মুরছিত ভেল।
সহচরিগণ কর বয়নহি দেল ॥
শ্বাস-হীন হেরি সবহুঁ বিভোর।
রোয়ত ধনি তব শ্যাম করি কোর ॥
এক সখি যুগতি করল অনুপাম।
শ্রবণে কহই তব রাধা নাম ॥
বহুখনে শ্রবণে পৈঠল সেই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোড় ॥
রোই রোই সুবদনি পরিচয় দেল।
কোরে কয়ল সব দুখ দূরে গেল ॥
বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ।
হেরি চমকিত রাধাবল্লভ দাস ॥ —তরু. ৭৭৪

২৬৭. সজনী প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতি কাতর
কহত কানু পরদেশ ॥

চাঁদক হেরি সুরজ করি ভাখয়ে
দিনহি রজনি করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
বিরহ পিয়ক করি ভান॥
কব আওব হরি হরি সঞে পুছই
হসই রোয়ই খেণে ডোরি।
সো গুণ গাই শ্বাস খেণে কাঢ়ই
খণহি খণহি তনু মোড়ি॥
বিধুমুখি-বদন কানু যব পোঁছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে কামিনি
বল্লভদাস সুখে মাতি॥ —তরু. ৭৭০ ; কীর্তনানন্দ ৩১৯

টীকা : এই পদেও রাধা কৃষ্ণের কোলে থাকিয়াই কাতরস্বরে বলিতেছেন যে কানু বিদেশে গিয়াছেন। তিনি তাই বিরহজ্বালায় এমন সন্তপ্ত হইয়াছেন যে চাঁদের জ্যোৎস্না তাঁহার নিকট সূর্যকিরণের মতন অসহ্য বোধ হইতেছে, আবার দিনকে রাত্রি মনে করিতেছেন। হরির কাছেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন হরি কবে আসিবেন। উন্মত্তার ন্যায় তিনি ক্ষণে হাসিতেছেন, ক্ষণে কাঁদিতেছেন। কখনও বা দয়িতের গুণ গাহিতে গাহিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। কখনও বা অঙ্গ মোড়া দিতেছেন। তারপর কানাই যখন নিজের পরিচয় নানা রূপে দিতে লাগিলেন ও সুন্দরীর মুখ মুছাইতে আরম্ভ করিলেন তখন কামিনী মদনপ্রভাব অনুভব করিয়া সুখে মাতিলেন—বল্লভদাসও সুখী হইলেন।

পঞ্চম স্তবক

সূচক পদাবলী

২৬৮. শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞি
পাতশার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা॥
ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গ মলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে॥

দরবেশ-রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পাসরিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে কাতরে গোসাঞি বলে
মো অধমে স্পর্শে কি লাগিয়া॥
অস্পৃশ্য পামর দীন দুরাচার মন্দ হীন
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নহোঁ তোমা স্পর্শিবার॥
ভোট-কম্বল দেখি গায় প্রভু পুন পুন চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া ছিঁড়া এক কাঁথা লৈয়া
প্রভু-স্থানে পুন আগমন॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধাকৃষ্ণ-মাধুরি
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে॥
কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নাড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ-নাম গাঁথা
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস॥
গিয়া গোসাঞি সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে
কহে রূপ গদ্‌গদ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে
এইরূপে কথো দিন থাকে॥
কথো দিন তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চস্বরে আর্ত্ত-নাদে রাধা কৃষ্ণ বলি কান্দে
এইরূপে থাকে কথো দিন॥
কথো দিন অন্তর্ম্মনা ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষ-তলে।

স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম-গুণে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে ॥
কখন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই চারি গ্রাস।
ছাড়িয়া ভোগ-বিলাস তরু-তলে কৈলা বাস
এক দুই দিন উপবাস ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লোটায় কায়
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস বড় মনে অভিলাষ
কবে হব তার দাসের দাস ॥ —তরু. ২৩৬২

২৬৯. শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে রঘুনাথ দাস-চিতে
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহ সম্পদ নিজ-রাজ্য অধিপদ
মল প্রায় সকল ত্যজিল ॥
পুরশ্চর্য কৃষ্ণ-নামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে
গৌরাঙ্গের পদ-যুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ান-গোচর হবে কবে ॥
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া
গোবর্ধনের শিক্ষা গুঞ্জাহারে।
ব্রজ-বনে গোবর্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিল তাহারে ॥
চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়িবারে
বিরহ আকুল ব্রজে গেলা।
দেহ-ত্যাগ করি মনে গেলা গিরি-গোবর্ধনে
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা ॥
ধরি রূপ সনাতন রাখিলা তার জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা ॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান ব্রজ-ফল গব্য খান
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্তন করি
রাধাপদ ভজন যাহার ॥

ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ গুণ গানে
স্মরণে ত সদাই গোঙায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥

... ...

কান্দে গোসাই রাত্রিদিনে পুড়ি যায় তনু মনে
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনাকে দেহ-ভার
বিরহে হইল জরজর॥
রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস পূরাহ মনের আশ
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
প্রভু মোরে কর পরসাদ॥ —তরু. ২৩৭০

:২৭০ (শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু তুয়া
শ্রীচরণ কব নিরখিব নয়ান ভরিয়া॥
শুনিয়া অশেষে গুণ পাঁজরে বিন্ধিলে ঘুণ
মরি যাঁউ নিছনি লইয়া॥
পিরিতে গঢ়ল তনু দশবান হেম জনু
চান্দ মুখ অরুণ অধরে।
ঝলকে দশন কাঁতি জিনি মুকুতার পাঁতি
হাসি কহে অমৃত মধুরে॥
পরাণের পরাণ যার রূপ-সনাতন আর

পণ্ডিত কৃষ্ণ লোকনাথ জানে দেহ ভেদমাত্র
সরবস্ব শ্রীরাধারমণ॥
প্রেম বিতরণ রঙ্গ চৈতন্য চরণ ভৃঙ্গ
শ্রীনিবাসে দয়ার অবধি।
সভে মেলি রসাস্বাদ ভাব ভরে উনমাদ
এই ব্যবসায় নিরবধি॥

লীলাসুধা সুরধুনি রসিক মুকুটমণি
রসাবেশে গরগর হিয়া।
হাহা অনুরাগ-সিন্ধু হাহা দীনজন বন্ধু
যশ গায় জগত ভরিয়া॥
হাহা মূর্তি সুমধুর হাহা করুণার পুর
হাহা চিন্তামণি গুণ খণি।
হাহা প্রভু একবার দেখাহ মাধুরী সার
শ্রীচরণ কমল লাবণি॥
অনেক জন্মের পরে অশেষ ভাগ্যের বলে
তুয়া পরিকর পদ পাঞা।
নিজ করমের দোষে মজিলুঁ বিষয় রসে
জনম গোঙানু খেলাইঞা॥
তোমার গুণে পতিত পাবনে আশা বন্ধ।
লোভিত চঞ্চল মতি উপেখিলে নাহি গতি
ফুকরে এ মনোহর মন্দ॥ —বরাহনগর পুথি ২৫

টীকা: মনোহর দাস 'অনুরাগবল্লী'তে লিখিয়াছেন যে তিনি রামশরণ চট্টরাজের শিষ্য। চট্টরাজের গুরু রামচরণ চক্রবর্তী, তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাসের গুরু গোপাল ভট্ট।

রঘুনাথ-যুগল—ভট্ট রঘুনাথ ও দাস রঘুনাথ।

২৭১. পহু দ্বিজ-রাজ-বর মূরতি মনোহর
রত্নাকর করি জান।
প্রভু শ্রীনিবাস প্রকাশ-স্বরূপ
হরিনাম করিতহি গান॥
কনক-বরণ তনু প্রেম-মূরতি জনু
কণ্ঠহি তুলসিক মাল।
গৌর-প্রেম-ভরে অহর্নিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলি কাল॥
শ্রীমদ্ভাগবত উজ্জ্বল-গ্রন্থ যত
দেশে দেশে করিলা প্রচার।
পাষণ্ড অধমগণে করুণাবলোকনে
সভাকারে কয়ল উদ্ধার॥
ভকত-প্রিয়োত্তম ঠাকুর নরোত্তম
রামচন্দ্র প্রিয় দাস।

অধম নিতান্ত গোপী- কান্ত হৃদয়ে পহু
চরণ করহ পরকাশ ॥ —তরু. ২৩৮২

টীকা: গোপীকান্তের পিতা হরিরাম আচার্য রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্য।

২৭. হেন দিন শুভ পরভাতে।
শ্রীনরোত্তম নাম পহু মোর গৌর-ধাম
বার এক স্মৃতি হয় যাতে ॥
যাহার সঙ্গতি-কাম শ্রীল কবিরাজ নাম
ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর।
ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস খেতরী করিলা বাস
প্রাণ-সমতুল কলেবর ॥
নিত্যানন্দ-ঘরণী জাহ্নবা ঠাকুরাণী
ত্রিভুবনে পূজিত-চরণ।
যাহার কীর্তন-কালে রুধির পুলক-মূলে
দেখি কৈল চৈতন্য-স্মরণ ॥
ভাব দেখি আপনি জাহ্নবা ঠাকুরাণী
নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।
পতিত-পাবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর
তবে জানি মহিমা নিশ্চয় ॥ —তরু. ২৩৮৪

টীকা: যেদিন অন্তত একবারও আমার প্রভু গৌরধামস্বরূপ নরোত্তমের নাম স্মরণ হয় সেদিনের প্রভাতকে শুভ বলিয়া জানি। সেই নরোত্তমের সঙ্গলাভ-কামনায় রামচন্দ্র কবিরাজ গৃহ পরিকর, এমন কি, ঠাকুর শ্রীনিবাসকে ছাড়িয়া খেতরিতে বাস করিতেন। রামচন্দ্র নরোত্তমের প্রাণতুল্য ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী

পদস্খলনের যুগ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংস্কৃতে কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেন। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'নিকুঞ্জবিরুদাবলী' ও 'সুরতকথামৃত', ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' ও ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'প্রেমসম্পুট' রচনা করেন। এ সব তথ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র তাঁহার ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী'র সমাপ্তিকাল ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে তিনি 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সংকলন করেন। ঐ গ্রন্থে হরিবল্লভ বা কখনও শুধু বল্লভ ভণিতায় তিনি স্বকৃত অনেকগুলি পদ সংযোজন করিয়াছেন। পদগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল। ঐ সব পদের ভাবগাম্ভীর্য কিছু থাকিলেও পদলালিত্য বিশেষ নাই।

রাধামোহন ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে রাধামোহন বাংলার পরকীয়াবাদীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের গুরু। তাঁহার পদামৃতসমুদ্রে হরিবল্লভের কোনও পদ নাই। রাধামোহন অধিকাংশ পদই রচনা করিয়াছেন উজ্জ্বলনীলমণি-বর্ণিত ভাবসমূহের দৃষ্টান্ত দিবার জন্য। গোবিন্দদাস কবিরাজ যে যে ভাবের পদ লেখেন নাই, রাধামোহন সেই সেই ভাবের পদ রচনা করিয়া চৌষট্টি রসের কীর্তনগানের পূর্ণতা বিধান করেন। রাধামোহন গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গীর অনুসরণ না করিয়া যে কয়েকটি পদ শাদা বাংলায় লিখিয়াছেন সে-কয়টির কবিত্ব প্রশংসনীয়। রাধামোহনের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা অনন্যসাধারণ।

দীনবন্ধু দাস চণ্ডীদাসী ঢঙে অনেক পদ রচনা করিয়া সংকীর্তনামৃতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সংকীর্তনামৃতের এক অনুলিপি ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে হইয়াছিল। যাদবেন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার পদ যখন সংকীর্তনামৃতে আছে তখন উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সংকলিত হয় নাই। সংকীর্তনামৃতে হরিবল্লভ ও রাধামোহনের পদ নাই।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র নরহরি চক্রবর্তী প্রায় দেড় হাজার পদ লিখিয়াছেন। ছন্দের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বর্ণিত রসাদির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনিও অনেক পদ লিখিয়া গীতচন্দ্রোদয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নরহরির কবিপ্রতিভা উঁচুদরের ছিল না। কীর্তনানন্দ-সংকলয়িতা গৌরসুন্দর দাস ও পদকল্পতরুর সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাস দুই-চারিটি কবিতা লিখিতেন বটে, তবে তাঁহারা কবি ছিলেন না। উদ্ধবদাস বৈষ্ণবদাসের বন্ধু

ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও একজন উদ্ধবদাসের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার পদের নমুনা রসকলিকায় পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে শশিশেখর, চন্দ্রশেখর ও জগদানন্দ শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের কোনও পদই অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও পদসংকলনে স্থান পায় নাই। তবে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে সংকলিত পদরসসারে ও পদরত্নাকরে ইঁহাদের পদ আছে। শশিশেখর ও জগদানন্দের পদের শব্দঝংকার ও ছন্দোবৈচিত্র্য অতুলনীয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর স্বাভাবিকতা তাঁহাদের রচনায় বিরল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রেমদাস ও মধ্যভাগে লালদাস প্রাদুর্ভূত হন। মূলের ভাব বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা উভয়েরই অসামান্য। তবে যদুনন্দন দাসের মত পদলালিত্যের ইঁহারা অধিকারী নহেন।

সংখ্যায় খুব কম হইলেও যাদবেন্দ্র, বিপ্রদাস ও অজ্ঞাতপরিচয় নাসির মামুদ বাৎসল্য ও সখ্য-রসের পদরচনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

প্রথম স্তবক

গোষ্ঠ

২৭৩. ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলক ভালে বন-মালা দেহ গলে
সিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
বিশাল অর্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান
সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল-নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষ বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥ —তরু. ১১৭৫

২৭৪. শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যতেক রাখাল।
সভাই আইল নিতে গোঠেরে গোপাল ॥
শুন কাহ্নাই ভায়্যা মোর শুন কানাই ভায়্যা।
বাথানে রহিল ধেনু তোর মুখ চাঞা ॥
আগে চালাইতে ধেনু পাছু পানে ফিরে।
নিহারয়ে চারি দিগ না দেখি তোমারে ॥
গহন কাননে ভাই ভরসা তোমার।
মরিলে পরান দান কে করিবে আর ॥
বুঝিঞা আইলাম ভাই তোমার নিকটে।
যাদবেন্দ্র বলে পহুঁ যাত্যে হবে গোঠে ॥ —সংকীর্তনামৃত ৭৭

২৭৫. বলরাম করি সঙ্গে সব শিশুগণ রঙ্গে
কর জোড়ি যশোদারে কয়।
তোমার গোপাল বিনু রাখিতে নারিব ধেনু
এই কথা কহিল নিশ্চয় ॥
প্রভাত সময় জানি আস্যাছিল নীলমণি
বিদায় হইতে তোর ঠাঞি।
তোমার বিতথা দেখি ছল ছল দুটি আঁখি
সেই হত্যে মুখে বোল নাঞি ॥
যে বল সে বল তুমি কহিলাম স্বরূপ বাণি
কানাই বিনে নাহি যাব গোঠে।
ক্ষুধায়ে আনিয়া ভাত কেবা দেবে হাথে হাথ
প্রাণদান কে দিবে সঙ্কটে ॥
আমা সভার প্রাণ কানু চরাতে না দিব ধেনু
কান্ধে করি নিব শিশুগণে।
বস্যাঞা তরুর ছায় বসনে করিব বায়
চান্দ মুখ দেখিব নয়নে ॥
যদি ভায়্যার সঙ্গে যাই চরাত্যে না হবে গাই
বেণুরবে ফিরে সব গাই।
বসিঞা কৌতুক দেখি এই সুখে সঙ্গে থাকি
যাদবেন্দ্র বলিহারি যাই ॥ —সংকীর্তনামৃত ৭৯

২৭৬. আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।

নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে রইও সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে ॥
ক্ষুধা হৈলে লৈয়া খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয় বাধা পানাই হাতে থুইয়
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥ —তরু. ১১৮৯

টীকা :—বাধা—বধ্য—খড়ম। পানাই—চর্মপাদুকা।

২৭৭. বাছা রয়্য রয়্য রয়্য রে।
নেহারি বয়ন ভরিঞা নয়ন
তবে তুমি ছাড়্যা যায়্য রে ॥
ধাঞা আগে যাঞা রাণী নেহারিঞা
দেখে চান্দ-মুখখানি রে।
কাতর অন্তরে আখি-জল ঝরে
মুখে না নিঃসরে বাণী রে ॥
নিশ্চয়ে জানিলাম বনে যাবি বাছা
শুন এক বোল কই রে।
মা বল্যা ডাক জুড়াকু মোর বুক
তবে ফির্যা ঘরে যাই রে ॥
কল্যাণ কুশলে গোসাঞি রাখু তোরে
তোমায় আমায় এই দেখা রে।
যাদবেন্দ্র কয় তবে প্রাণ রয়
যদি ঘুচে ধেনু রাখা রে ॥ —সংকীর্তনামৃত ৮৬

২৭৮. স্নেহেতে ব্যাকুল রাণী করয়ে ক্রন্দন।
বলরাম হস্তে কৈলা কৃষ্ণ সমর্পণ ॥

শ্রীদাম সুদাম আদি সখাগণ সঙ্গে ॥
বনেতে চলিলা কৃষ্ণ অতিবড় রঙ্গে ॥
তবে নন্দ উপানন্দ আদি গুরুজন।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে হৈলা বিষাদিত মন ॥
ব্রজাঙ্গনাগণ যত কৃষ্ণ দেখিবারে।
লতা আড়ে রহে কেহ অট্টালিকোপরে ॥
ব্রজকুল ছাড়ি কৃষ্ণ বনেরে পয়ান।
ব্রজবাসী দেহে যৈছে ছাড়য়ে পরাণ ॥
বিনয় বচনে কৃষ্ণ সবে প্রবোধিয়া।
গোচারণে যায় শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া ॥
—১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে লালদাস-রচিত উপাসনাচন্দ্রামৃত পৃ ১৫২

২৭৯ বাজত সব গোঠ বাজনা সাজত বলবীরে।
মদে ঘূর্ণিত নয়ান যুগল পাগ লটপটী শিরে ॥
বলাইয়ের মুখ নয় যেন বিধু রে।
বুক বাহি পড়ে মুখের নাল শ্বেত কমলের মধু রে ॥
গলে বনমালা বাহে তাড়বালা শ্রবণে কুণ্ডল সাজে।
ধব ধব ধব ধবলী বলিয়া ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে ॥
নব নটবর নীলাম্বর লম্ফে লম্ফে আওয়ে।
মদে মাতল কুঞ্জর গতি উলটি পালটি চাওয়ে ॥
আপন তনু ছায়রি হেরি রোষাবেশ হোই।
হুঁ হুঁ পথ ছোড়হ বলি অঙ্গুলি ঘন দেই ॥
কর পাঁচনী কক্ষে দাবি রাঙ্গাধূলি গায়ে মাখে।
কা—কা—কা—কা কানাই বলিয়া ঘন ঘন ঘন ডাকে ॥
পদাঘাত মারি কহে তিন বেরি স্থিরা ভব ধরণী।
শশিশেখর কহে হলধর- পদতলে যাও নিছনি ॥
—কীর্তনগীতরত্নাবলী ৪৮১

২৮০. চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলি-খুরলি গান রি ॥
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আও রি আও রি
ফুকরি চলত কান রি ॥

বয়েস কিশোর মোহন ভাতি
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু-চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভান রি।
আগম নিগম বেদসার
লিলায় করত গোঠ-বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥ —তরু. ১৩২৯

২৮১. রাখালে রাখালে মেলা খেলিতে বিনোদ খেলা
অতিশয় শ্রম সভাকার।
ননীর পুতলী শ্যাম রবির কিরণে ঘাম
স্রবে যেন মুকুতার হার॥
শ্রীদাম আসিয়া বোলে বৈসহ তরুর তলে
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুনা পুলিনে ভাই কংসের দোহাই নাই
কেহু পাত্র মিত্র কেহু প্রজা॥
বনফুল আন যত সপত্র কদম্ব শত
অশোক-পল্লব আম্র-শাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জা-গুচ্ছ শিখী-পাখা॥
গাঁথিয়া ফুলের মালে কদম্ব-তরুর তলে
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধব দাসে ভণে কক্ষতালি ঘনে ঘনে
আবা আবা বাজায় বয়ান॥ —তরু. ১২৩৭

রামপ্রসাদ গৌরীর গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। একটি পদ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হইল—

জগদম্বারে যব পূরে বেণু (যব পূরে বেণু)
ধায় বৎস ধেনু উঠে পদরেণু।
বেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দেলোয়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ, সো মা কি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ।
হত কোকিল-মান, সুমাধুরী তান, শ্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যাজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ॥

ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাষে ॥

দ্বিতীয় স্তবক

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ

২৮২. ওহে কালা কেনে এমন দেখি।
অরুণ বরণ হৈয়াছে আঁখি ॥
তিল আধ থির হইতে নারো।
অনুখণে মনে মনে কি করো ॥
স্বপনে না শুনো বচন আন।
কি কথা শুনিতে পাতহ কাণ ॥
নিরজনে একা দোসরহীন।
না জানি কি জপ রজনীদিন ॥
ছাড়িয়া মোহন মুরলী গান।
বুঝিয়ে কেহো বা হরিল প্রাণ ॥
শুনি নরহরি সখীর পাশে।
কহে শ্যামশশী মধুর ভাষে ॥ —গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৪৪

২৮৩. আজু ঐছে কাহে হোয়ল কান।
তেজল মুরলী মনোহর গান ॥
খসই সুবেশ না শকত সমারি।
চঞ্চল চহুঁ দিশ চকিত নেহারি ॥
শ্রবণহি আন বচন নাহি ভায়।
বিকশিত কমল বিপিন তঁহি ধায় ॥
চম্পক কুসুমদামে ভরু ছাতি।
সোঁপই সজল নয়ন তহি মাতি ॥
খণে পুলকিত তনু অনুপম হাস।
খণে খণে খোলি পরয়ে পীতবাস ॥
কৈছন রঙ্গ বুঝন নাহি যায়।
ভণ ঘনশ্যাম পুছত তুহুঁ তায় ॥ —গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩২০

টীকা: এই ঘনশ্যাম হইতেছেন ভক্তিরত্নাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী। ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথের পুত্র।

২৮৪. রাই ! কি কানুর লেহা।
তুয়া নাম গুণ শুনিতে চিতে না
তিলেক বাঁধয়ে থেহা ॥
তুয়া তনুখানি ধ্যান অনুখণ
মন না আনত চলে।
কনক কেতকী রাখি আঁখি পাশে
ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
যমুনা হইতে আইলা যে পথে
রাখিয়া চরণ চিন।
সেই পথে সদা সে ধূলি ধূসর
না জানি রজনি দিন ॥
ধনি ধনি তুয়া সোহাগ গমনে
বিলম্ব উচিত নহে।
কুলবতীকুলে সুযশ ঘুষিবে
দাস নরহরি কহে ॥ —গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৫০

২৮৫. আজু হাম পেখলু নন্দকিশোর।
কেলি বিলাস সবহুঁ অব তেজল
অহনিশি রহত বিভোর ॥
যবধরি চকিত- বিলোকি বিপিন তটে
পালটি আওলি মুখ মোড়ি।
তব ধরি মদন- মোহন তনু কাননে
লুঠই ধৈরযপণ ছোড়ি ॥
পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি
পাওব চেতন নাহ।
ভুজগিনী দংশি পুনহুঁ যদি দংশয়ে
তবহি সময়ে বিষ যাহ ॥
অব ধনি শুভখণ[1] মণিময় ভূষণ
ভূষিত তনু অনুপাম।
অভিসরু বল্লভ- হৃদয় বিরাজহ
জনু মনি-কাঞ্চন দাম[2] ॥ —ক্ষণদা. ৩।৬

পাঠান্তর : ১. অব শুভখণ ধনি—ক্ষণদা.

২. সাজে রচহ অভিসার।
কহ হরিবল্লভ তুহুঁ নিজ বল্লভ
কণ্ঠে লাগই মণিহার॥ —কীর্তনগীতরত্নাবলী ৮২

টীকাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবল্লভ ভণিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন।

২৮৬. এ সখি! বিধি কি পুরাওব সাধা।
পুন কিয়ে নিরখব রূপ-নিধি রাধা॥
যদি পুন মিলব সো বর-রামা।
তব জিউ-ভার ধরব কোন কামা॥
তুহু ভেলি দূতী পাশ ভেল আশা।
জিউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা॥
শুনি হরি বচন দূতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাহা রমণী-কদম্বে॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণি-মালা॥
—ক্ষণদা. ১৭।৫; গীতচন্দ্রোদয় ৪০৫; কীর্তনানন্দ ১৩৭; তরু. ২১৪

২৮৭. শুন হে সুবল ভাই নিবেদন করি।
কহিতে বাসিয়ে লাজ না কহিলে মরি॥
গাঁথিয়া চাপার মালা কেনে পরাইলি।
চাঁপার বরণ গোরি মনে পড়াইলি॥
জাবটে আছয়ে ধনি জটিলার ঘরে।
বিষম সঙ্কট বড় কি বলিব তোরে॥
যদি মিলাইতে পার আনি কোন ছলে।
হইব তোমার দাস জনমের তরে॥
তুয়া পথ চাহিয়া রহিলাম কুঞ্জবনে।
না আইলে রসবতী মরিব পরাণে॥
শুনিয়া সুবল কত করি আশোয়াস।
জাবটে চলিল কহে দীনবন্ধু দাস॥ —সংকীর্তনামৃত ১৪৬

২৮৮. সুচতুর সুবল পবনগতি ধাওল
আওল জাবট মাঝ।
জটিলা নিকট আসি পহুঁ কহতহি
মলিন বদন দ্বিজরাজ॥

আগো মাই কি কহিব দুখ পরিশেষ।
বাছুরি খোজি খোজি ইথে আওলুঁ
ভরমি ভরমি কত দেশ॥
পানি পিয়াসে শাস নাহি আওত
জীবন করত কি জান।
শুনি জটিলা কহে রন্ধন মন্দিরে
শীতল জল কর পান॥
নিরজন অন্দর রাইক মন্দির
সুবল চলল তহিঁ মাঝ।
দীনবন্ধু কহে সুবল হেরি গৃহে
রাই বুঝল সব কাজ॥ —সংকীর্তনামৃত ১৪৭

২৮৯. হাসিয়া সুবল কহে শুন বিনোদিনি।
তোমারে লইঞা যাত্যে আসিয়াছি আমি॥
সহচর ছাড়ি হরি তোমার লাগিয়া।
অচেতনে রাধাকুণ্ডে আছয়ে পড়িয়া॥
ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়ান।
দরশন দিঞা শ্যামের দেহ প্রাণদান॥
আপনার বসন ভূষণ দেহ মোরে।
ধরিঞা তোমার বেশ আমি রহি ঘরে॥
দীনবন্ধু দাস বড় উলসিত হিয়া।
পূরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া॥ —সংকীর্তনামৃত ১৪৯

২৯০. নিজ মন্দির তেজি গতং ঝটকং।
চল কুণ্ডল মণ্ডিত গাণ্ডতটং॥
মদমত্ত মতঙ্গজ মন্দগতা।
জটিলাপদপংকজধুলিনতা॥
নত কন্ধর হেরি গতং সুবলং।
জটিলা জয় দেই বলে কুশলং॥
মধুরাধরবাদ সুধা সম মীঠ।
গুরু গর্বিত চর্দিত দেওল পীঠ॥
সুবলাকৃতি রাই বনে গমনং।
পহু দীনবন্ধু কলিতং ভণনং॥ —সংকীর্তনামৃত ২৫১

টীকা: রাধা নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া শীঘ্রগতিতে চলিলেন। যাইবার সময়ে

তাঁহার কুণ্ডল গতিবেগে দুলিয়া গণ্ডতট শোভিত হইল। তিনি মদমত্ত হস্তীর গতিকে পরাজিত করিয়া চলিলেন। যাইবার সময় জটিলার পদপঙ্কজের ধূলি নত হইয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে নতকন্ধরে যাইতে দেখিয়া সুবল মনে করিয়া জটিলা 'জয় হউক' বলিয়া কুশল কামনা করিলেন। মধুর অধরে সুধাসম মিষ্ট অতি মৃদুস্বরে গান করিতে করিতে গুরুগৌরব ছেদন করিয়া রাধা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। সুবলের বেশধারিণী রাধার বনগমনলীলা দীনবন্ধু তাঁহার প্রভুর নিকট বর্ণনা করিলেন।

এইরূপ বাংলা-সংস্কৃতে মেশানো কয়েকটি পদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর লিখিয়াছেন—

কস্ত্বং শ্যামল ধামা।
হরি-কিঙ্কর হাম উদ্ধব নামা॥
অত্র হরিস্তব কুত্র।
মধুপুরে বসই বরজ-জন মিত্র॥···ইত্যাদি।

শশিশেখর লিখিয়াছেন—

রাধে জয় রাজপুত্রি
মম জীবন দয়িতে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি।
জানা গেল তুয়া চরিতে॥
কিঞ্চিদপি কস্মিন্নপ-
রাধং নহি করোমি।
সঙ্কেত করি আনঘরে যাহ
নিশি জাগিযে আমি॥

যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত এই পদটিও অর্বাচীন সংকলনগ্রন্থে দেখা যায়—

ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্যং মম গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুরব পুরী প্রতি প্রত্যক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশি করল ভ্রমণা॥

তৃতীয় স্তবক

কলহান্তরিতা

২৯১. মান বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়ানে বহে তপতহি লোর॥

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চান্দ।
অখিল জীবের মন-লোচন ফান্দ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥
কান্দিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক্ মোর বুধি।
অভিমানে উপেখলুঁ কানু গুণনিধি॥
যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিব কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিল সব নরনারী।
এ রাধামোহন কহে নহিল হামারি॥

—পদামৃতসমুদ্র ১৮১ ; তরু. ৪৩২

২৯২. কাহে তুহু কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অব সে বসি রোঅসি কাহে রাধে
মেরুসম মান করি উলটি যব[২] বৈঠলি
নাহ তব[৩] চরণ ধরি সাধে॥
তবহু তারে[৪] গারি ভর্ৎসন করি তেজলি
মান বহু রতন করি গণলা।
অবহুঁ ধরম পথ কাহিনী উগারই[৫]
রোখে হরি বিমুখ ভই চললা॥
কাতরে তুয়া চরণযুগ বেড়ি ভুজপল্লবে
নাহ নিজ শপতি বহু দেল।
নিপট কটুনাদি কোটি-[৬] কঠিনী বজরাবুকী
কৈছে কর চরণপর ঠেল[৭]॥
অবহুঁ সব সখিনী তব নিকটে নাহি বৈঠব
হেনই অবিচার যদি করলি।[৮]
চন্দ্রশেখর কহে কতয়ে সমুঝয়েল
মঝু বচন উপেখি প্রেম ভাঙ্গলি॥[৯]—কীর্তনগীতরত্নাবলী ২৩০

পাঠান্তর : বৈষ্ণবপদাবলীতে—
১. অবশি বসি রোয়সি কি রাধে ; ২. ফিরি ; ৩. যব ; ৪. উহে, ৫. অবহুঁ তুহুঁ ধরম-পথ-কাহিনী উগারসি ; ৬. নিপট কুটি-নাটি কটু ; ৭. কৈছে জিউ ধরলি কর ঠেল ; ৮. করলি যদি এহেন অবিচার ; ৯. চন্দ্রশেখর কহে এ ধনি তুহুঁ অবোধিনি করব অব কোন পরকার।
টীকা : বজরাবুকী—বজ্র দিয়া গঠিত বুক যাহার।

২৯৩. স্বর্ণবর্ণ বিবর্ণ ভৈ গেল
পূর্ণ বিধুমুখ তূর্ণ নিরসল
নয়ন-পঙ্কজ নিরহি ভীগল
হিয়াক অম্বর রে।
মান ভেল তুয়া জীবন গাহক
নহিলে উপেখসি রসিক নায়ক
যো ভেল সো ভেল অবহুঁ মুগধিনি
আপনা সম্বর রে॥
যতহি মনমাহা কোপ উপজত
ততহি কোপ করিতে অনুচিত
পায়ে পরণত যো জন হোয়ত
তাহে কি তেজহ রে।
হিত কহইতে অহিত মানসি
সুহৃদ্-গণে তুহুঁ বৈরিসম জানসি
অতয়ে দেখিশুনি নিরবে রহি পুনি
উত্তর না দেই রে॥
যো বিনু যুগশত নিমিখে হোয়ত
সো তোহে মিনতি করল কতশত
করহি কর জোরি, গলহি অম্বর
ধরণী লোটাঅল রে।
ঐছে হঠপন উলটি বৈঠলি
কান্তবদন নিতান্ত না হেরলি
চন্দ্রশেখর ভনয়ে ভামিনী
পিরীতি ভাঙ্গল রে॥ —কীর্তনগীতরত্নাবলী ২৩৬

২৯৪. বিকলে! বিকলে তেজি বৈঠি রহুঁ।
প্রতিপক্ষ-সভা চহুঁ-ওর বহু॥
যব নন্দ-সুনন্দন পাদে পড়ে!
তব কোপ বঢ়ে অভিমান চঢ়ে॥
নিজ-সঙ্গি-সখীগণ-হীত কথা।
শুনি ভালে উঠায়লি ভাঙ-লতা॥
বিহি চীত-উচীত সুদণ্ড কিয়া।
অব খর্ব ভয়ো সব গর্ব-তুয়া॥
অধিরূঢ় অহঙ্কৃতি ভদ্র নহে।
শশিশেখর বেরহি বের কহে॥ —বৈষ্ণব পদাবলী ১০২৭

টীকা : বিকলে ! বিকলে তেজি—হে বিকলে, বিকলতা ছাড়িয়া। চহুঁ-ওর বহু—চারিদিকে অনেক। কোপ বঢ়ে—ক্রোধ বাড়ে। খর্ব ভয়ো—খর্ব হইল।

চতুর্থ স্তবক

শ্রীগৌরাঙ্গ

২৯৫. কহ কহ অবধোত নিমাঞি কেমন আছে।
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া
তোরে কখন কি পুছে॥
যে অঙ্গ কোমল ননীর পুতল
আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে নানা দেশে গ্রামে
কেমনে ভ্রময়ে সে॥
এক তিল যারে নে দেখি মরিতাম
বাড়ীর বাহির দূরে॥
সে কেমনে মোরে ছাড়িয়া আছয়ে
কোথা নীলাচল-পুরে॥
মুঞি অভাগিনী আছি একাকিনী
জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব কারে কি কহিব
প্রেমদাস জ্ঞান-হারা॥ —তরু. ২২৬৫

২৯৬. ভাবে দর-দর বুক গৌরাঙ্গের চাঁদ-মুখ
ভাবিতে শুইলা শচী মায়।
কনক কষিল জনু গৌরসুন্দর-তনু
আচম্বিতে দরশন পায়॥
মায়েরে দেখিয়া গোরা অরুণ নয়ানে ধারা
চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠি মায় ধাই কোলে করে তায়
ঝরঝর নয়ানের নীরে॥
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ কান্দে দুহুঁ থির নাহি বান্ধে
কহে মাতা গদগদ ভাবে।

আন্ধল করিয়া মোরে ছাড়ি গেলা দেশান্তরে
প্রাণ-হীন তোমার হাত্যাশে ॥
যে হউ সে হউ বাছা আর না যাইহ কোথা
ঘরে বসি করহ কীর্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর পরম বৈষ্ণব-বর
কি ধরম সন্ন্যাস-করণ ॥
এতেক কহিতে কথা জাগিলেন শচী মাতা
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কান্দিয়া উঠে ধারা বহে দুহুঁ দিঠে
প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥ —তরু. ২২৬৭

টীকা : প্রেমদাস ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন।

২৯৭. ভ্রমই গৌরাঙ্গ পহুঁ বিরহে ব্যাকুল।
প্রেম উনমাদে ভেল যৈছন বাউল ॥
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা গেও সো সব আনন্দ কেল ॥
থাবর জঙ্গম যাহে আগে দেখই।
বরজ সুধাকর কাঁহে তাহে পুছই ॥
খেণে গড়াগড়ি কান্দে খেণে উঠি ধায়।
রাধামোহন কাহে মরিয়া না যায় ॥ —পদামৃতসমুদ্র ৩৩২

টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গের দশ দশা লইয়া রাধামোহন ঠাকুর দশটি পদ লিখিয়াছেন। এই পদটি উন্মাদ দশার।

২৯৮. কেলি কলানিধি সব মনোরথ সিধি
বিহরই নবদ্বীপ ধাম।
বিদগধ শেখর সবগুণ আগর
সুখময় সতত বিরাম ॥
হরি হরি হৃদিমাঝে বড় শেল মোর।
যো শচীনন্দন হৃদয়-আনন্দন
মাথুর বিচ্ছেদে বিভোর ॥
গুরুতর গান গরিমতর সূচক
নিমগন সোই তরঙ্গে।
চিন্তা সন্ততি সবহুঁ দূর গেও
অথ উনমাদবর ভঙ্গে ॥

নয়নক নীর অধিক থকিত ভেল
হোয়ত সো বর মোহ।
রাধামোহন ভণ যো লাগি বিহরণ
মুরতিমন্ত্র ভেল সেহ॥ —পদামৃতসমুদ্র ৩৩৭

টীকা: এটি মোহ দশার বর্ণনা।

২৯৯. নবদ্বীপ চান্দ চান্দ জিনি সুন্দর
নাগর বিদগধ রাজ।
আনন্দ রূপ অনুপাম গুণগণ
আনন্দ বিতরণ কাজ॥
হরি হরি হামারি মরণ অব ভাল।
সে যদি সুখময় কেলি উপেখিয়ে
বিরহ ভাবে খেপু কাল॥
কত অনুতাপ প্রলাপহুঁ কত বিধি
অপরূপ কত উনমাদ।
কত বেরি মোহ হোয়ত পুন ঘন ঘন
দশমী দশা পরমাদ॥
ভাগে ভকতগণ উচ হরি বোলই
তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন অনুবাদ ঐছন
যতে করু ইহ রস পান॥ —পদামৃতসমুদ্র ৩৩৩

টীকা: এটি দশমী দশার বর্ণনা।

৩০০. দামিনীদাম-দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোণ কুসুম তাহে কোন গণইয়ে
প্রাতর অরুণ-সন্তাপ॥
গোরারূপে যাঙ্‌ বলিহারি।
হেরি সুধাকর মুরছি চরণতলে
পড়ু দশনখ-রূপধারী॥
সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ
মানি আপন মন-তাপে।
নিজ তনু জারি তসম সম করইতে
পৈঠল অনল-সন্তাপে॥

যা সম বিধিক অধিক নাহি অনুভব
তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহ পহুঁক তুলনা পহুঁ
নিরুপম গৌর-কিশোর ॥ —জগদানন্দ-পদাবলী পৃ ১০

টীকা: দামিনীদাম-দমন—বিদ্যুতের মালাকেও যে কান্তি দমন করিয়াছে। দূরে গেও দরপকি দাপ—বিদ্যুতের দর্প দূর হইয়াছে। দশনখ-রূপধারী—শ্রীগৌরাঙ্গের চরণের দশটি নখ যেন দশটি চাঁদ। সুবরণ বরণ—স্বর্ণবর্ণ। জারি—পোড়াইয়া।

৩০১. পাপে পূরল পৃথিবী পরিসর
পেখি পরমদয়াল।
প্রেম-পর পরি- পূর্ণ পয়োনিধি
প্রকট পরণত-পাল ॥
পহুঁ পতিতপাবন নাম।
পশুপ-প্রেয়স পিরীতি পররস
প্রণয়-পীযূষ-ধাম ॥
প্রণত-পালক পদবী পালই
পূরব পরিকর মেলি।
প্রচুর পাতকী পাপ পরিহরি
পাদ পরণত কেলি ॥
পূজই পশুপতি পদ্ম-আসন
পাদ-পঙ্কজ-দ্বন্দ্ব।
পরপঞ্চ পথে পড়ি পেখি না পেখল
জগত-আনন্দ অন্ধ ॥ —জগদানন্দ-পদাবলী পৃ ৩১

টীকা: পৃথিবী পরিসর—বিস্তীর্ণ ধরণী। প্রেম পর পরিপূর্ণ পয়োনিধি—শ্রেষ্ঠ প্রেমে পরিপূর্ণ সমুদ্রস্বরূপ। পরণত-পাল—প্রণতদিগকে পালন করেন যিনি। পশুপ-প্রেয়স—পশুপালন করেন যে কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়। পরপঞ্চ—প্রপঞ্চ, মায়া।

৩০২. পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমারি গুণ গাই ॥
যে-সে কুলে জন্ম হউ যে-সে দেহ পাইয়া।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া ॥
চিরকালে আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায় ॥

তোমার নামেতে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ-গানে যেন সদা হউ ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে॥
অশ্রু-কম্প পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু॥
যে-সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমায় রহ মতি॥ —গুরু. ৩০১৩

ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। নাগরিক সভ্যতা তখন পাশ্চাত্ত্যের আভায় দীপ্ত। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে তখনও বৈষ্ণবীয় রসধারা জনসাধারণের চিত্তকে অভিষিক্ত করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গতিবেগে কায়স্থ কমলাকান্ত ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে 'পদরত্নাকর' ও প্রায় ঐ সময়েই নিমানন্দ 'পদরসসার' সংকলন করেন। নিমানন্দ একজন মাঝারি ধরনের কবি। কমলকান্তের মাত্র ১৩টি পদ পাওয়া যায়। তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্মণ শক্তিসাধক কমলাকান্তও কয়েকটি বৈষ্ণব-পদ রচনা করেন।

সুপ্রসিদ্ধ কানুঠাকুরের বংশে উদ্ভূত কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণযাত্রায় পদাবলীর নূতন রূপ প্রদান করেন। তাঁহার যাত্রাগানের পালায় কথাভাষায় লিখিত কৃষ্ণ-লীলার গানগুলি পূর্ববঙ্গে এক অপূর্ব ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পদকর্তা হইতেছেন নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভূত বর্ধমান জেলার মাড়োগ্রাম নিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী। ইনি সংস্কৃতে গৌরাঙ্গচম্পূ রচনা করেন এবং বাংলায় তোটক ছন্দে অনেক সুন্দর পদ লেখেন। ইহার রচিত 'গীতমালা'য় ৪৩৯টি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ আছে।

কান্ত ও বীরচন্দ্র নামক পদকর্তার কোনও পরিচয় জানা যায় না। উঁহাদের পদের ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয়ত উঁহারা পদ লেখেন নাই। উঁহাদের পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও সংকলনে পাওয়া যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রভু জগবন্ধু অনেকগুলি ভাবঘন সুললিত পদ রচনা করেন। তাঁহার কয়েকটি পদে দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগ থাকায় তাঁহার কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদ জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাশে স্থান পাইবার যোগ্য।

গোবর্ধনের নিকটস্থ গোবিন্দকুণ্ডের সিদ্ধ মনোহরদাস বাবাজী মহারাজ 'বৈদগ্ধবিলাস' নামে বৃন্দাবনলীলার এক মনোরম কাব্য রচনা করেন।

রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজ ভাবের আবেগে দ্রুত পদরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ পদরচনায় অগ্রসর হন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবি বৈষ্ণবীয় বিষয় লইয়া পদ রচনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনার পিছনে বৈষ্ণবীয় সাধনার প্রভাব নাই বলিয়া এই সংকলনে উহা ধৃত হইল না।

প্রথম স্তবক

রূপাভিসার

৩০৩. কি ক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল।
তিলে না হেরিতে রূপ অন্তরে পশিল॥
হেরিতে না পেলাম রূপ তিলেক দাঁড়াইয়ে।
অবলার মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল॥
কমলাকান্তের বাণী শুন গো প্রাণ সজনি।
সখি! অকলঙ্ক কুলে বুঝি কলঙ্ক ঘটিল॥

—কমলাকান্ত-পদাবলী পৃ ৯৪

টীকা: এই কমলাকান্ত শাক্ত সাধক ছিলেন। ইনি ১২১৬ সালে অম্বিকা-কালনা হইতে বর্ধমানে আসিয়া রাজসভার সভাপণ্ডিত হন।

৩০৪. কি হেরিলাম যমুনার কূলে।
চিকণ কালিয়া রূপ কদম্বের তলে॥
কেমন বান্ধ্যাছে চূড়া কুটিল কুন্তলে।
বেড়িয়া দিয়াছে তাথে বকুলের মালে॥
ময়ূরের পাখা তাথে করে ঝলমলে।
হেরিয়া কামিনী তাথে হারাইল কুলে॥
চন্দন-তিলক শোভে সুচারু কপালে।
অঙ্গদ-বলয়া সাজে সুবাহু যুগলে॥
হিয়ার উপরে দোলে মালতীর মালা।
কটি মাঝে পীত ধটী সদাই চপলা॥

চরণে পরশে আসি ধড়ার অঞ্চলে।
ভুবনমোহন রূপ নিমানন্দ বোলে॥ —অপ্র. পদরত্নাবলী ৫২৪

৩০৫. চল দেখি যায়্যা সই চল দেখি যাঞা।
দাঁড়াঞা রৈয়াছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া।
ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরী বাজাঞা॥
হরিয়া লইল কুল বঙ্কিম চাহিয়া।
অঙ্গ-ভঙ্গ কৈল শ্যাম ঈষদ হাসিয়া॥
কালিয়া বরণখানি অঞ্জন জিনিয়া।
হেরি রূপ পুলকিত নিমানন্দের হিয়া॥—অপ্র. পদরত্নাবলী ৫২৫

৩০৬. রহিতে না পারি আর ঘরে।
চল যাব বৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরশনে
প্রাণ মোর কেমন কেমন করে॥
আয় গো তুরিত হৈয়া বেশ দে মোর বানাইয়া
চল যাব শ্যাম ভেটিবারে।
কবরী-কুসুম আনি বান্ধ গো বিনোদ বেণী
মালতীর মালা থরে থরে॥
কুঙ্কুম চন্দন ঘসি সাজা গো বদন-শশী
মোহিত করিব নট-বরে।
শুনিয়া ললিতা কহে এমন উচিত নহে
গুরুতে গঞ্জন দিবে তোরে।
কানুর পিরিতি খানি মরমে রাখিবি ধনি
বেকত করবি কুলাচারে।
এ ব্রজ-মণ্ডল মাঝে তোর সম কেবা আছে
রূপ-গুণ-রসের পাথারে॥
শুনিয়া ললিতা-কথা মনেতে পাইয়া বেথা
নারে চিত্ত স্থির করিবারে।
নিমানন্দ দাস বোলে কি করিবে জাতিকুলে
পিরিতি পাগলী কৈল যারে॥—অপ্রকাশিত পদরত্না. ৫২৬.

৩০৭. অমন করে যাস্ নে, যাস্ নে, যাস্ নে গো ধনি যাস্ নে।
তোরে বারে বারে বারণ করি গো কিশোরী,

ও রাই ! আমাদের কথা পায়ে ঠেলিস্ নে
যাস নে গো ধনি যাস্ নে ।
ও তুই, ত্যজিয়ে সঙ্গিনী, যেয়ে একাকিনী,
ও রাই ! গহন বনে ধনি, প্রাণ হারাস্ নে ।
যাস্ নে গো ধনি যাস্ নে ॥
—কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্নবিলাস' পৃ ১৪৬

৩০৮. চলিলা বৃষ-ভানু-সুতা গহনে ।
ব্রজ ভূপতি-নন্দন ভাবি মনে ॥
অভিসার-সুখার্ণবে মগ্নমনা ।
মদমত্ত গজেন্দ্র-বধূ গমনা ॥
মুরলীধর-দরশন আশ সুখে ।
নাহি জানত পথ-পয়ান দুখে ॥
কুশ-কণ্টক লাগত প্রতি পদে ।
গণই নাহি সো সব প্রেমমদে ॥
চলিতে চলিতে তুলিতে চরণে ।
মণি নূপুর নাদ করে সঘনে ॥
চুটকি ঝুনু ঝুনু ঝুনু গরজে ।
চটকাবলি যা শুনি লাজ ভজে ॥
কটিতে রসনা সুখে নাদ করে ।
শুনি সারস যে ধ্বনি সেই ধরে ॥
ঘন দোলত হার উরসি তটে ।
নিরখি রজনী-কর গর্ব টুটে ॥
বর চম্পক বেণী-মুখে দোলিছে ।
জনু কাল ফণী রতনে গিলিছে ॥
অতি সৌরভ মোহন মত্ত মনে ।
ভ্রমরা-ভ্রমরী পড়িছে বদনে ॥
দিঠি মিলিব কি করি লাজে হরি ।
মুখ দেখিব তার কিরূপ করি ॥
ধরয়ে যদি নাগর মোর করে ।
ছুঁও না বোলব আমি লাজ ভরে ॥
করি হট সো যদি জোর করে ।
ধরিব তখনি ললিতার করে ॥

যদি কুঞ্জ ঘরে মোরে লয় ছলিয়া।
তবহুঁ কহব তার কর ধরিয়া॥
মন মধ্যে ইহা কহিতে কহিতে।
রসনা রসিয়া উঠিলা বলিতে॥
… …
চলিলা সকলে সুখে মনে।
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ ভণে॥ —গীতমালা

পদটি সংস্কৃতের মতন হ্রস্বদীর্ঘ স্বর বজায় রাখিয়া পড়িতে হইবে।

টীকা : গহনে—বনে। চটকাবলি—শ্যামাপাখীরা। উরসি তটে—বক্ষঃস্থলে। বরচম্পক—শ্রেষ্ঠ এক চাঁপাফুল।

৩০৭. এল রসরাজ পরি সুখ সাজ
বন-মাঝারে বাজায়ে বাঁশরীয়া।
পরিহরি লাজ ত্যজি গৃহকাজ
কুঞ্জবনমে ধাওয়ত কিশোরিয়া।
শুনি বাঁশী গান বহিছে উজান
তটিনী যমুনা কল নাদিনিয়া।
শুনি বাঁশী গান তুলি কেকা তান
সুখে নাচত গাওত শিখিনীয়া॥
ল'য়ে রথবর দেব দিবাকর
অস্তাচল পানে চলল ধাইয়া।
পূরব আকাশে বিধুয়া প্রকাশে
বাপী জলমে জাগল কুমুদিয়া।
হ'য়ে বিষাদিনী মানিনী নলিনী
ধনী মানভরে মুদল আঁখিয়া।
হাতে বনমালা বৃষভানুবালা
সখিগণ সনে আওল সাজিয়া।
মোহনে হেরিয়া মধুর হাসিয়া
আসি মিলল বামে বিনোদিনীয়া॥
হাতে হাতে ধরি সব সহচরী
দিল হুলাহুলী যুগলে ঘিরিয়া।
বলে বন্ধু দীন হ'ল গত দিন
ভজ রাধাশ্যামে হৃদয় ভরিয়া॥
—প্রভু জগদ্বন্ধু-কৃত 'বিবিধ সঙ্গীত' ১৩

৩১০. ধনী প্রবেশিল কুঞ্জ-বনে।
অতি হরষিতে আনন্দিত চিতে
মিলিলা শ্যামের সনে॥
হের দেখসিয়া দেখ ওগো সই
হের দেখসিয়া আসি।
জলদের কোলে করে ঝলমল
যেমন উদয় শশী॥
দেখ না কুঞ্জের মাঝে গো সই
দেখ না কুঞ্জের মাঝে।
অতি অদভূত দেখ না বেকত
ভ্রমর-কমল সাজে॥
কিবা সে দোহাঁর রূপ ওগো সই
কিবা সে দোহাঁর রূপে।
নিমানন্দদাসে হেরিয়া বিলাসে
ডুবিল রসের কূপে॥ —অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ৫২৯

দ্বিতীয় স্তবক

গো ষ্ঠ

৩১১. আজি বনে যাবি কি না যাবি কানাই,
ও তাই জান্‌তে এসেছি।
এমন ভাবিস্‌নে মনে, তোরে নিতে এসেছি।
সেধে সেধে নিতুই নিতুই, না নিলে যাবিনে কি তুই
আমরা কি ভাই তোর এতই কেনা নফর নফর হয়েছি॥
উঠিল গগনে বেলা, ছুটিল সব ধেনু মেলা
ব'য়ে গেল খেলার বেলা, এখনো কর্‌লিনে মেলা।
আজ কাননে গিয়ে গোপাল। ভিন্ন ক'রে দিব গো-পাল
দিনেক দুদিন একা গো পাল্, সবে এ মন্ত্রণা করেছি।
কাননে কাল খেলায় হেরে, বয়েছিলে কাঁধে ক'রে
সেই কথা কি মনে ক'রে বসিয়ে রয়েছ ঘরে?
এ যে তোর অন্যায় ভারি, আমরাও ত ভাই খেলায় হারি।
দশ দিন তোরে কাঁধে করি, না হয়, একদিন কাঁধে চড়েছি॥
—কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'বিচিত্র বিলাস' পৃ ২৬৮

৩১২. সাধে কি বিলম্ব করি যাইতে কাননে।
ভাই রে বৃথা অনুযোগ কর সবে অকারণে॥
মা যে আমায় দেয় না বিদায়
ভাই রে সুবল হ'ল কি দায়।
বুঝায়ে মায় নে ভাই আমায়
তা নইলে বল্ যাই কেমনে॥
জননীর বাঞ্ছা গৃহেতে রাখিতে
ভাই রে, তোদের বাঞ্ছা কাননেতে নিতে।
কিন্তু আমার বাঞ্ছা সবার মন তুষিতে
এক দেহে তা বা ঘটে কি মতে॥
যদি বলি যাই মা গোঠে, অম্নি যে মা কেঁদে উঠে।
আবার না গেলে ভাই, তোমরা সবাই কত দুঃখ কর মনে॥
—বিচিত্র বিলাস পৃ ২৬৯

৩১৩. ও মা ব্রজেশ্বরি গো
তোমার নীলরতনে দিতে মোদের সনে
ক'রো না ক মনে কিছু ভয়।
বেলা অবসান হ'লে আনিয়ে দেব গোপালে
মা, তোমার কাছে কহিলাম নিশ্চয়॥
সঁপে দে গো মোদের হাতে রাখ্‌ব সদা সাথে সাথে
সেধে সেধে দিব খেতে ক্ষীর সর ননী।
সকলে চরাব ধেনু বাজাইয়ে শিঙ্গা বেণু
ছায়াতে রাখিব কানু তাপিত হলে ধরণী॥
—বিচিত্র বিলাস পৃ ২৭১

৩১৪. ধর্, নে বেণু ধর
দেখো, রেখো বনে কাছে হলধর।
পলকে পলকে হারাই যে বালকে
তিলে ননী খাওয়াই চাহিয়ে অধরে।
তোরা ত বনে কানু নিবি রে
যায় না যেন বাছা নিবিড়ে
দেখেছি স্বপন ভীত হয় মন
কংস-চরে চরে নিবিড়ে।
তাই বলি হলি! থেকো সচকিত
বনে যেন ঘটে না রে বিপরীত।

দিলাম দুধের গোপালে চরাতে গো-পালে
না জানি কপালে কিবা ঘটে মোর।
গোঠে মাঠে যেয়ে ওরে বাছা রাম।
মাঝে মাঝে সবে করিবি বিরাম
প্রবল হ'লে রবি, তরুতলে রবি
অনিলেতে সবে হবি এক ঠাম;
নিকটে নিকটে চরাবি গোগণ
ক্ষণে ক্ষণে বাছা দেখো রে গগন,
যদি সাজে ঘন, সগণে সঘন
নিয়ে ধেনু বৎস আসিবি রে ঘর। —বিচিত্র বিলাস পৃ ২৭৩

৩১৫. সখা সঙ্গে প্রাণনাথ যাবে গোচারণ।
এত কাল কি করি রব শূন্য ভবন॥
কি করিয়া যাবে মোর এই বহু কাল।
নারী করি অবোধ বিধি ঘটাল জঞ্জাল॥
সখা হইতাম যদি সঙ্গে রহিতাম।
নিজ মনোমত কাম পূর্ণ করিতাম॥
তাহা না হইল মোর সাধ না পূরিল।
চিরকাল দুঃখে কেবল মোর দিন গেল॥
এ ভাব ভাবিতে বেগ করিল ধারণ।
প্রাণনাথে বলে মুই যাব গোচারণ॥
—সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজী-কৃত বৈদগ্ধবিলাস

টীকা : শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তাহাতে রাধার দুঃখ দেখিয়া সুবল বলিলেন তিনি রাধা হইয়া ঘরে থাকিবেন, আর রাধা সুবলের বেশ ধরিয়া গোষ্ঠে যাইবেন। পরবর্তী পদে রাধার সুবলবেশ ধারণ বর্ণিত হইয়াছে।

৩১৬. কটিতটে নীল ধড়া মস্তকে মোহন চূড়া
পদে নূপুর গলে বনমাল।
নাসা অগ্রে গজমতি কর্ণেতে কুণ্ডল দ্যুতি
রাখাল ফোটাতে দিব্য ভাল॥
ক্ষুদ্র ঘণ্টা কটিপর স্বর্ণ বিছা অধঃ তার
দিব্য কোচা অগ্রেতে দোলয়।
দক্ষ হস্তে পদ্মনীল বামে যষ্টি দিব্য লাল
কক্ষে বেত্র শোভা অতিশয়॥

বক্ষোপরি পদ্মমালা মুক্তমালা সু-উজ্জ্বলা
মুক্তাথোপ বেণী পৃষ্ঠদেশ।
রাধিকা রাখালবেশ দেখি ভুলে সর্বদেশ
হৃদি সুখ করিল প্রবেশ॥
—সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজী-কৃত বৈষ্ণববিলাস।

৩১৭. (ব্রজসখাদের বিলাপ)
তাই ভেবে কি ভাই রে সুবল
ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই।
আমরা সামান্য ভেবে কখন মান্য করি নাই।
খেলার বেলা করি দ্বন্দ্ব, কতই যে বলেছি মন্দ
সে মন্দ কি ভেবে মন্দ ত্যজিল ব্রজের সম্বন্ধ?
কত মেরেছি ধরেছি, কাঁধে করে চড়েছি
আপনি খেয়ে খাওয়ায়েছি, তো তো কার করেছি সবাই
ভাই রে সুবল! বল্ রে সুবল, উপায় কি করি বল
কেবল রিপুবল হইল প্রবল।
কানাই বিনে বৃন্দাবনে দুর্বলের আর কি আছে বল॥
—কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্নবিলাস' পৃ ৮০

তৃতীয় স্তবক

গৌরাঙ্গ-লীলার পূর্বাভাব

৩১৮. কানু কহে রাই কাহতে ডরাই
ধবলী চরাই আমি।
রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিতি
নেহের পসরা তুমি॥
ফিরি বনে বনে ধবলীর সনে
পিরিতি কি জানি রাই।
যে গুণে আমারে বেন্ধেছ কিশোরী
তার শোধ দিতে নাই॥
তুমি মম বুদ্ধি সর্ব কর্ম সিদ্ধি
সকল সুখদ ধাম।

আমি সব শ্রম নিবারি বাঁশিতে
লইয়া তোমার নাম ॥
তুমি মহাজন যে কর ভর্ৎসন
সুধাসম মোহে লাগে।
মোর নাগরালি বাঢ়ালো কিশোরী
পিরিতি রভস আগে ॥
তোমার ঋণ সে শোধিতে নারিনু
প্রেম অনুরাগ বিনে।
কান্ত কাহে কানু গৌরাঙ্গ হইলে
খালাস পাইবে ঋণে ॥

।—ক. বি. ৬২০৪ পুথির ২০৭৩ পদ ; কীর্তনগীতরত্নাবলী ২৮৮

পুথিতে শেষ দুটি কলি নাই। কীর্তনগীতরত্নাবলীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলি নাই।

৩১৯. তেজি কালবরণ করিব ধারণ
তোমার অঙ্গের কান্তি।
তুয়া নাম লয়্যা কান্দিয়া কান্দিয়া[১]
অশ্রুজলে হব[২] শান্তি।
মিলি ভক্তগণ করিব কীর্তন
রাধা রাধা ধ্বনি করি।
খেনে খেনে মূর্চ্ছা হইব যখন
অচেতনে রব পড়ি ॥
ভাবি তব ভাব[৩] হবে প্রেমভাব[৪]
স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
তেজি বংশীবর হব দণ্ডধর
রাখিতে নারিবে কেহ ॥
অমূল্য রতন তব প্রেমধন
অযাচকে দিব অ্যানে।[৫]
বীরচন্দ্র কহে তবে সে খালাস
পাইবে প্রেমের ঋণে ॥[৬] —পদরত্নমালার পুথি

পাঠান্তর: বৈষ্ণব পদাবলীতে—১. তুয়া নাম লয়্যে আকুল হইয়ে ; ২. হবে, ৩. যবে তব ভাব ; ৪. ভাবি হবে প্রেম ; ৫. আনি ; ৬. প্রেমেতে হব অঋণী।

চতুর্থ স্তবক

প্রার্থনা

৩২০. হে কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধু শ্রীরাধার প্রাণ-বন্ধু
ব্রজ-বনিতার প্রাণ-নাথ।
মো হেন পামর-জীবে কাতর দেখিয়া কবে
কৃপায় করিবে আত্ম সাথ॥
হে রাধিকা বিনোদিনি শ্যাম-মন-বিমোহিনি
মো বড় অধম অতি-দুখী।
কবে নিজ নাথ সনে দেখা দিয়া দুখী জনে
শীতল করিবে দুই আঁখি॥
হে রাধার সখীগণ মুঞি বড় অকিঞ্চন
করুণা করিবে কবে মোরে।
বৃন্দ-দেবী কবে মোরে বান্ধিয়া করুণা ডোরে
আকর্ষিয়া লবে ব্রজ-পুরে॥
ভব কবলিত-চিত নাহি জানে হিতাহিত
সুখ মানে নরকে পড়িয়া।
হে যমুনা বৃন্দাবন রাধা-কুণ্ড গোবর্ধন
কেশে ধরি লহ উদ্ধারিয়া॥
হে গৌরাঙ্গ গদাধর কৃপাময়-কলেবর
কৃপাময় তার ভক্তগণ।
কমল কাতর জীবে ভীষণ ভবার্ণবে
কবে দিবে করাবলম্বন॥

টীকা : পদকর্তা কমলাকান্ত 'পদরত্নাকর' গ্রন্থ ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে সংকলন করেন।

৩২১. মধুসূদন হে জয় দেবপতে।
বিপদে পরিপীড়িত লোকগতে॥
তব নাম সুমঙ্গল গান করি।
অতি ঘোর ভবাম্বুধি-বারি তরি॥
সুগভীর নদী সলিলে পড়িয়ে।
তব নাম জপি ভজতি করিয়ে॥
করুণাময় চাহি কৃপাদ্র মনে।
কর পার নদীজল ভক্ত জনে॥

তব নামে কলঙ্ক কেন ঘটে।
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ রটে॥ —গীতমালা

টীকা: লোকগতে—লোকের যিনি পরমগতি।

৩২২. বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে।
সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে॥
নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখীসনে অভিসারে।
এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে॥
হাতে বাঁশী কাল শশী, নিকুঞ্জ কাননে পশি।
সুখে রহিতেন বসি মমোপরে প্যারী সনে॥
ক্রীড়া শ্রমে রাধাশ্যাম ঘামিতেন অবিরাম।
অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে॥
বন্ধু বলিছে কাতরে, কবে রাধা দামোদরে।
সাজাব হৃদয় ভ'রে হেরিব জ্ঞান নয়নে॥
—প্রভু জগদ্বন্ধু-কৃত **'বিবিধ সঙ্গীত'**

৩২৩. কর্মফলে গতাগতি স্বর্গ অপবর্গ প্রাপ্তি
জ্ঞানে অঙ্গকান্তি-প্রাপ্তি নির্বাণ হয় জ্যোতিতে।
যোগে ষড়্‌চক্র ভেদে কুণ্ডলিনী শক্তিযোগে
জীব আত্মা সহস্রারে মিলায় পরমাত্মাতে॥
বেদবিধি অনুসারে ভক্তিযাজন করলে পরে
শুদ্ধ ভক্তি লাভ ক'রে (পায়) ঈশ্বর-নিষ্ঠা মনেতে।
চৌষট্টি অঙ্গেতে নবধা ভক্তির পথে
ভজিলে সে নন্দসুতে স্বরূপ জাগে মনেতে॥
সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ হয়
স্বরূপ শক্তি প্রকাশ পায় মধুর বৃন্দাবনেতে॥
... ...
শ্রীরাধা গোবিন্দ ভজিলে আনন্দ
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণানন্দ নাহি ইহার পরেতে॥
অদ্বয়-ব্রহ্ম তত্ত্বসার পরমাত্মার সুবিচার
ভগবানের সারাৎসার পাবি রে ভাই ব্রজেতে॥
রাধা-রাধারমণ চরণ সুভরিয়ে বলে চরণ
নিতাই গৌর করি স্মরণ চরণ দেও মোর শিরেতে॥

যদি আমায় চরণ দিবে দাস-নাম সার্থক হবে
ভক্তি শক্তি উদয় হতে সেবা পাব কুঞ্জেতে ॥
—শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস-কৃত

৩২৪. ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান ॥
বরজ-বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ ॥
কুসুমে গাঁথবুঁ হার।
তুলসী-মণিমঞ্জরী তার ॥
যতনে দেওবুঁ সখী করে।
হাতে লওব সখী আদরে ॥
সখী দিব তুয়া দুঁহুক গলে।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ॥
সখী কহব শুন সুন্দরি।
রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ॥
গাঁথবি মালা মনোহারিণী।
নিতি রাধা কৃষ্ণ-বিমোহিনী ॥
তুয়া রক্ষণ-ভার হামারা।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা ॥
রাধামাধব সেবনকালে।
রহবি হামার অন্তরালে ॥
তাম্বুল সাজি' কর্পূর আনি।
দেওবি মোয়ে আপন জানি ॥
ভকতি বিনোদ শুনি বাত্।
সখীপদে করে প্রণিপাত ॥
—কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' ২৫

৩২৫. শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হবে।
উপাধি-রহিত-রতি চিত্তে উপজিবে ॥
কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল-বিলাস ॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল।
কদম্ব-কাননে যাব ত্যজি জাতি-কুল ॥

স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবর্ণ্য প্রলয়।
স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয়॥
ভাবময় বৃন্দাবন হেরব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হয়ে সেবিব দুজনে॥
কবে নরোত্তম সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-সর চিত্তে প্রবেশিবে॥
চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি অন্য রতি।
করযুড়ি মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি॥
—কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'কল্পতরু' পৃ ১২৩

৩২৬. প্রভু দয়াল সাধুমুখে আমি শুনেছি।
অকূল পাথারে পড়ে ডাকৃতেছি॥
অস্পৃশ্য পামর আমি
দয়ার ঠাকুর তুমি
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি॥
করিতে পতিতোদ্ধার
এবার নদেয় অবতার
আমার সমান পতিত প্রভু কোথা পাবে আর॥
তুমি দিয়ে চরণতরী
উঠাও হে কেশে ধরি
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি॥
—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-কৃত 'নিমাইসন্ন্যাস'

৩২৭ জয় শচীনন্দন।
করুণা করিয়ে দাসে করহে স্মরণ।
তুমি আমার আমি তোমার
ভুলিল মোর মন॥
তব বদন-কমল পরিমলে টলমল
কোটি ইন্দু সুশীতল ভুবন উজ্জ্বল
দেহি চরণকমল মধুপান।
তব বদনচন্দ্রমা শারদা পূর্ণিমা
ছার চাঁদ কি উপমা বলরামে দাও হে ক্ষমা
দেহি দেহি ভকতি দান॥ 'নিমাইসন্ন্যাস'

টীকা: মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ স্বয়ং অনেক পদে বলরাম ভণিতা দিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

কুরুক্ষেত্রে মিলন

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ পর্যায়ে কুরুক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের মিলন একটি বিশেষ লীলা। এটি গীত না হইলে চৌষট্টি রসের কীর্তন পূর্ণ হয় না; অথচ এ বিষয়ে কোন পদ নাই। তাই নিতান্ত অক্ষম হইলেও সংকলয়িতা তাঁহার গুরুদত্ত নাম, নিতাই ভণিতা দিয়া আধুনিক ভাষায় কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক আগে, সনাতন গোস্বামীর মতে রাজসূয় যজ্ঞের পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা ১০।৮২।১), কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীর মতে রাজসূয়ের পূর্বে (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ১৭৪), সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজের গোপগোপীদের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল।

গৌরচন্দ্রিকা

১. না জানি কি ভাবে গোরা হইলা বিভোর।
নতমুখে কাঁপে শুধু চোখে বহে লোর॥
স্বরূপের গলা ধরি কহে প্রিয় সখি।
মায়া কিংবা মতিভ্রম সমুখেতে দেখি॥
যাহারে পাইব বলি রাখিনু জীবন।
এতদিন পরে সে কি দিল দরশন॥
কহ সখি দেখি কিবা শ্যামন্তপঞ্চকে।
নন্দের নন্দন প্রাণ ব্রজের বন্ধুকে॥
কোথা গেল বনমালা শিখিপুচ্ছচূড়া।
শ্যামলসুন্দর কান্তি আর পীতধড়া॥
গুঞ্জামালা দ্বারকায় কিবা নাহি মিলে।
কেমনে ভুলায় তবে মহিষী সকলে॥
এত বলি গোরারায় করে হায় হায়।
নিতাই দেখিয়া দুখে ধরণী লোটায়॥

শ্রীবৃন্দাবনে ললিতার প্রতি শ্রীরাধা

কেন আর বল সখি কেন আর বল।
তীর্থস্নানপুণ্যে মোর কিবা হবে ফল॥
না যায় কঠিন প্রাণ পড়ি আছি ব্রজে।
কেমনে দেখাব মুখ লোকের সমাজে॥

যেদিন বন্ধুরে মোর দিয়াছি বিদায় ।
পোড়া বিধি সব সাধ দলিয়াছে পায় ॥
শ্যাম হেন বঁধু পায়্যা যে জন হারায় ।
নয়নের জলে তার পাষাণ মিলায় ॥
রাধার বিলাপ শুনি কহয়ে ললিতা ।
গোপনে পাঠায়ে লিপি ডাকিয়াছে মিতা ॥
তুমি তো নিজের সুখ কভু চাহ নাই ।
শ্যামের সুখের তরে চল যাই রাই ॥
সাজিল যশোদা সঙ্গে রাই কুন্দলতা ।
মুটকি বহিয়া চলে নিতাই সর্বথা ॥

শ্রীরাধার প্রতি ললিতা

৩. অনেক দিনের পরে হেরিবে বন্ধুকে ।
মলিন বসনে কেন চলিছ রাধিকে ॥
কত সাজায়েছি তোমা অভিসারকালে ।
এ বেশে দেখিতে হল এই ছিল ভালে ॥
কানুর সন্দেশ শুনি তৃণগুল্মলতা ।
পুলক-উজ্জ্বল হয়ে কহে কি বারতা ॥
কত ফুলদল আজি উঠেছে ফুটিয়া ।
বনমালা গাঁথিয়াছি পরাবে বলিয়া ॥
বৃষেয়া ধাইছে বেগে রথদল বাহি ।
কখন জুড়াবে আঁখি শ্যামমুখ চাহি ॥
ললিতা বচন শুনি রাধা অচেতন ।
নিতাই কাঁদিয়া করে চামর ব্যজন ॥

৪. উদ্ধব সচিবসখা কৃষ্ণেরে পাইয়া একা
নিবেদয়ে ধরিয়া চরণ ।
দাসেরে ক্ষমিও প্রভু তোমারে কোথাও কভু
দেখি নাই এত উচাটন ॥
তোমার আপনজন গোপগোপী বন্ধুগণ
ধাইয়াছে কুরুক্ষেত্র পানে ।
স্নান-দান ছল করি দেখিবে প্রাণের হরি
আন কথা নাহি তুলে কানে ॥

একান্ত নিভৃত স্থানে অন্যে যেন নাহি জানে
মেলনি উচিত সংগোপনে।
অন্তঃপুর সন্নিকটে মধুস্রবা নদীতটে
স্থান আছে তাঁদের কারণে॥
হয়ো না উতলা এত দিবস হইলে গত
প্রিয়জনে দিও দরশন।
নিতাই শুনিয়া ভাবে কেমনে মিলন হবে
নাই হেথা কোন কুঞ্জবন॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদা

৫. কতকাল পরে বাপ কতকাল পরে।
মা বলিয়া ডাক দিয়া আল্যা মোর ঘরে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাছা গিয়াছে নয়ন।
কেমনে দেখিব বল ও-চাঁদ বদন॥
কাছে এস কোলে এস যশোদাতুলাল।
কত কষ্ট দিল তোমা করিয়া রাখাল॥
লোকে বলে তুমি নাকি তুষ্ট রাজগণে।
যুদ্ধ করি পাঠায়েছ শমন-ভবনে॥
এত মারামারি বাছা করিতে কি আছে।
নিবারিতে তোমা বুঝি কেহ নাই কাছে॥
মা বলিয়া বারবার ডাক দেখি বাপ।
শুনিলে নিতাই বলে জুড়াবে সন্তাপ॥

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ললিতা

৬. দেখ বন্ধু চাহি রাধাপানে।
তোল নাই তার তুখ কানে॥
দূতীরা গিয়াছে কতবার।
আশ্বাস দিয়াছ বার বার॥
কত দেশ ঘুরিতেছ তুমি।
দূর বুঝি বৃন্দাবন ভূমি॥
পাসরিতে করেছি যতন।
নিজবশে নাই তার মন॥
তব পায়ে সঁপিল যে মন।
ধর্ম কর্ম তনু মন ধন॥

তারে ছাড়ি রহিলা কেমনে।
অকৃতজ্ঞ নাহি তোমা হেনে॥
জান তার বুকে কত ব্যথা।
নিতাই কাঁদয়ে শুনি কথা॥

ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ

৭. শুনহ ললিতা মোর মরমের বাণী।
সত্য তব অভিযোগ নতশিরে মানি॥
কেমনে আমার দুখ তোমারে বুঝাই।
কত সুখে আছি দেখ মুখপানে চাই॥
অতি খল দুষ্টমতি যত বৈরিগণ।
চারিদিকে খুঁজে ফিরে মোর প্রিয়জন॥
প্রতিশোধ ল'তে চায় করি নির্যাতন।
তাই আমি বৃন্দাবনে না করি গমন॥
ঐশ্বর্যগৌরবে সখি নাহি কিছু সুখ।
রাধিকার প্রেম বিনা নাহি ভরে বুক॥
দহিছে সুতীব্র তেজে বিরহের জ্বালা।
নিমেষে শুখায়ে যায় বুকে ফুলমালা॥
দু'হাতে লুকায়ে মুখ কাঁদয়ে শ্রীকৃষ্ণ।
নিতায়ের ফাটে বুক রাধিকা সতৃষ্ণ॥

সত্যভামার প্রতি তাহার সহচরী

৮. তব আজ্ঞা শিরে ধরি দেবি সত্যভামা।
গোপনে দেখিনু কৃষ্ণলীলা অনুপমা॥
কোন এক পৌর্ণমাসী দেবীর যতনে।
রাধিকা শোভিছে আজো কৈশোর-রতনে॥
তপস্যার জ্যোতিশিখা প্রায় সমুজ্জ্বল।
তারুণ্য লাবণ্যভলে করে ঝলমল॥
তাহার চরণতলে বসিয়া শ্রীহরি।
নয়নে নয়ন রাখি পিবয়ে মাধুরী॥
মুখানি মোছায় তার আপন বসনে।
জন্মে জন্মে তব দাস বলয়ে সঘনে॥
শ্রীকৃষ্ণের হেন শোভা কভু দেখি নাই।
মরিবারে চাহি লয়ে রূপের বালাই॥

শুনিয়া দূতীর বাণী দেবী ছাড়ে শ্বাস।
নিতায়ের মনে জাগে আনন্দ উচ্ছ্বাস॥

মি ল ন

৯. রাধা রাধা বলি কানু হারায় গেয়ান।
নিয়ড়ে বসিয়া ধনী করয়ে ধেয়ান॥
কাছে থাকি দূরে মানে কিবা অনুরাগে।
মিলনে বিরহজ্বালা শতগুণ জাগে॥
ক্ষণেকে চেতন পায়্যা হিয়া হিয়ে থাকে।
হারাবার ভয়ে বুঝি বুকে বাঁধি রাখে॥
অনুতাপে বলে কৃষ্ণ ক্ষমা কর ধন।
তোমার প্রেমের ঋণ শোধিব আপনি
তব ভাবকান্তি ধরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
লুটাব ধরণীতলে জনম ভরিয়া॥
নয়নের জলে মোর সাগর বহিবে।
সে কাঁদিবে মোর কথা যে জন স্মরিবে॥
বিস্ময়ে আকুল রাধা শুনি হেন বাণী।
নিতাই ভাবয়ে কবে হবে বা এমনি॥

পদসূচী

পদকর্তৃসূচী

	পদকর্ত্তা	পদসংখ্যা	মোট
২৭.	দীনবন্ধু	২৮৭-২৯০	৪
২৮.	দেবকীনন্দন	৮৮	১
২৯.	নয়নানন্দ	৩৪	১
৩ .	নরসিংহ দাস	২৪৫	১
৩১.	নরহরি চক্রবর্ত্তী	২৮২, ২৮৪	২
৩২.	নরহরি সরকার	৩৫-৩৭, ৪৫-৫০, ৯৮, ১১৩, ১১৪, ১৪৬, ১৬৬, ২২১, ২৩১	১৬
৩৩.	নরোত্তম দাস	১৪৪, ১৪৫, ১৬৫, ২১১, ২১৪, ২২৬-২২৮, ২৩০	৯
৩৪.	নসির মামুদ	২৮০	১
৩৫.	নিমানন্দ দাস	৩০৪-৩০৬, ৩১০	৪
৩৬.	নৃসিংহ	৭১, ৮১	২
৩৭.	পরমানন্দ	২২০	১
৩৮.	পরমেশ্বর দাস	৩১	১
৩৯.	পুরুষোত্তমদাস	২২৫	১
৪০.	প্রসাদদাস	২৫৮	
৪১.	প্রেমদাস	২৯৫, ২৯৬	২
৪২.	বলরামদাস	৪০, ৫৩-৫৪, ৬০-৬১, ৬৩, ৬৫-৬৬, ৬৮ ৭০, ৭৪, ৭৬, ৯২, ১০৩, ১০৪, ১১৮-১২০, ২২২	২০
৪৩.	বলরামদাস (কবিরাজ)	২৫৬, ২৬১	২
৪৪.	বল্লভ দাস	২৬৫, ২৬৭, ২৭২	৩
৪৫.	বসন্ত রায়	১১১-১১২, ১৬০, ১৬৪, ২০৯, ২১৭, ২১৮	৭
৪৬.	বাসুঘোষ	৪২, ৫২, ৭২, ৮২, ১১৫, ১৫৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৯২, ২০২, ২১৩	১১
৪৭	বিদ্যাপতি	১, ১১-১৩, ১৫-১৮, ২৪-২৭	১২
৪৮.	বিপ্রদাস ঘোষ	২৭৩	১
৪৯.	বীরচন্দ্র	৩১৯	১
৫০.	বীর হাম্বীর	১২১	১
৫১.	বৃন্দাবনদাস	৩৩, ১২৭, ২৩৩	৩
৫২.	বৈষ্ণবদাস	৩০২	১
৫৩.	বংশীবদন	৩২, ৬২, ১১৭, ১২৯, ১৬১, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৯৮-২০১, ২১৫, ২৪৫	১৫
৫৪.	ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩২৪, ৩২৫	২
৫৫.	ভবানন্দ	২৫৫	১

	পদকর্তা	পদসংখ্যা	মোট
৫৬.	ভাগবতাচার্য	২১০, ২৩৮	২
৫৭.	মনোহর দাস	২৫৯, ২৭০	২
৫৮.	মনোহর দাস (সিদ্ধ)	৩১৫, ৩১৬	২
৫৯.	মাধব আচার্য	১৮৩	১
৬০.	মাধব ঘোষ	২১৯, ২২৯	২
৬১.	মাধবেন্দ্রপুরী	১৪	১
৬২.	মালাধর বসু	১৯-২৩	৫
৬৩.	মুকুন্দ	৫৭	১
৬৪.	মুরারি গুপ্ত	৩৮, ১১৬	২
৬৫.	যদুনন্দন	২৪৮ ২৫০	৩
৬৬.	যদুনাথ	৮৪, ১৫৪, ১৫৮, ২৩৯	৪
৬৭.	যশোরাজ খান্	১২৮	১
৬৮.	যাদবেন্দ্র	২৭৪-২৭৭	৪
৬৯.	রঘুনাথ দাস	৮৩	১
৭০.	রঘুনন্দন গোস্বামী	৩০৮, ৩২১	২
৭১.	রাধারমণ চরণদাস বাবাজী	৩২১	১
৭২.	রাধাবল্লভ দাস	২৬৬, ২৬৮, ২৬৯	৩
৭৩	রাধামোহন ঠাকুর	২৯১, ২৯৭ ২..	৪
৭৪.	রামচন্দ্র	১১০	১
৭৫.	রামানন্দ বসু	৩১, ৫৫, ৬৪, ৯০, ১০০, ২১৫	
৭৬.	রায়শেখর	১৩০, ১৩১, ১৭৪, ১৭৭, ১৮৬, ২২২	
৭৭.	রূপগোস্বামী	৬৭, ২৪০	১
৭৮.	লোচন দাস	৯১	১
৭৯.	শঙ্কর ঘোষ	৫১	১
৮০.	শশিশেখর	২০৯, ২৯৪	২
৮১.	শিবানন্দ	৫১, ৪৪, ২৩২	৩
৮২.	শিশিরকুমার ঘোষ	৩২৬, ৩২৭	২
৮৩	শ্যামদাস	২৪৬, ২৪৭	২
৮৪	শ্যামানন্দ	১৩৭	১
৮৫.	শ্রীনিবাস আচার্য	১০৮	১
৮৬.	সুন্দর দাস	৫৮, ৫৯	২
৮৭.	হরিবল্লভ	২৮৫, ২৮৬	২